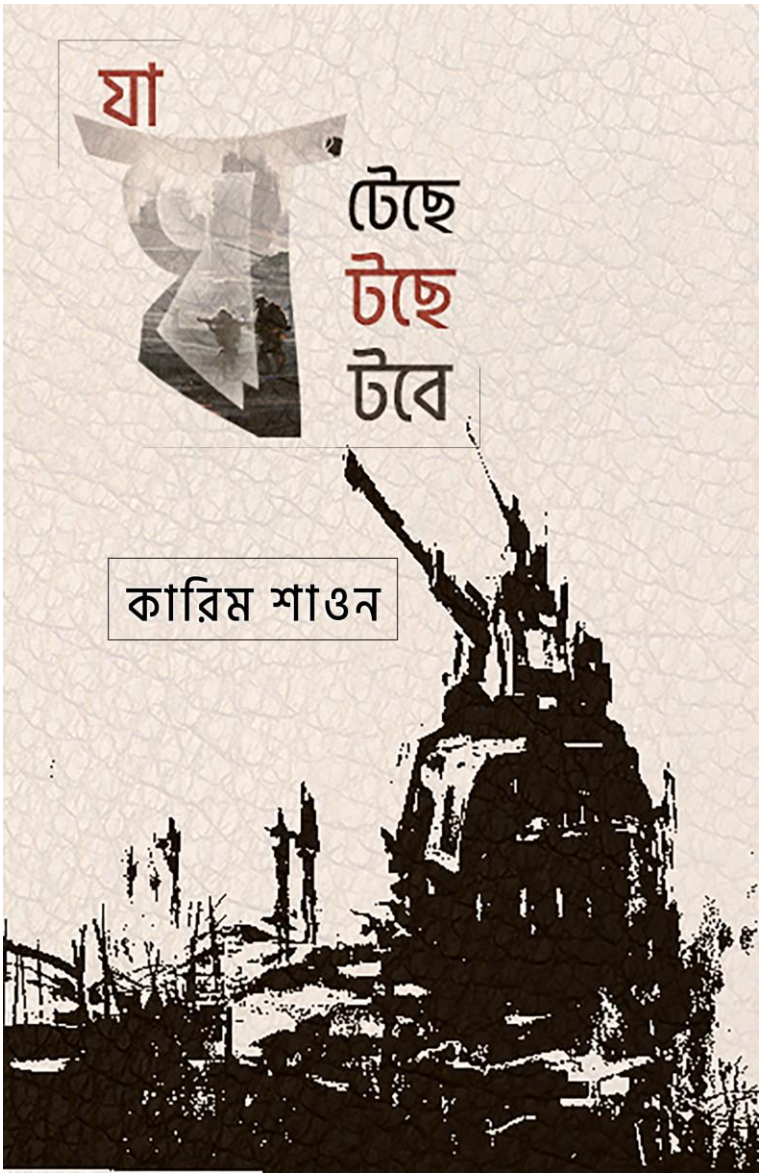
যা
ঘটেছে
ঘটছে
ঘটবে
কারিম শাওন

যা ঘটেছে
যা ঘটছে
যা ঘটবে

কারিম শাওন

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি ৪
কিছু কথা..... ৫
শান্ত প্রকৃতিতে অশান্তি ১৫
পূর্ণিমা রাতের অমাবস্যা.....১৯
ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ২৫
নতুন জাদুকর..... ৩৪
চোরের ওপর বাটপারি ৪৪
অনুশোচনার অভিনয় ৫০
সাবধান ! ওরা ধোঁকাবাজ..... ৫৯
বলির পাঁঠা..... ৭৩
জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ, আকাশে শকুন..... ৮১
সন্ত্রাসীরা সন্ন্যাসী সেজেছে..... ৮৫
ইতি কথা..... ১০০

লেখক পরিচিতি

কারিম শাওন।

একজন নবীন লেখক।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা পুরান ঢাকায়।

শিক্ষাজীবনের শুরু একটি মিশনারি স্কুল থেকে। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে মাধ্যমিক, ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৭ কলেজ) থেকে স্নাতকোত্তর সমাপ্ত করেন।

কলেজজীবনে সক্রিয়ভাবে ছাত্ররাজনীতি করেছেন। বর্তমানে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছেন। লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন ২০১৮ সালে। তার আলোচনার বিষয়বস্তু হলো–নাস্তিক্যবাদের যুক্তি খণ্ডন, ইসলামের সমালোচনার জবাব, ধর্ম নিয়ে বিভ্রান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মানবতাবাদ ইত্যাদি।

‘অন্ধ বধির মূক’ নাস্তিকতা বিষয়ক এবং **‘নারীবাদী বনাম নারীবাঁদি’** ইসলামের সমালোচকদের জবাবে তার আরও দুটি বই।

কিছু কথা

একটা মানুষ তার মৌলিক চাহিদার সবটাই যখন পূরণ করতে সক্ষম হয়, তখন সে উচ্চাভিলাষী হয়, অভিজাত জীবনযাপন করতে চায়। এটাও যখন পূরণ হয়ে যায়, তখন সে ক্ষমতার পেছনে ছোটে। ক্ষমতাধারী হওয়াটা বেশ কষ্টসাধ্য বলে সেটা অর্জনের পর প্রাণপণ চেষ্টা থাকে যেন তা হাতছাড়া না হয়। এগুলো মানবিক বৈশিষ্ট্য; যা উপেক্ষা করা কঠিন।

একটা ক্ষমতাধর জাতির বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত ওই ব্যক্তির ন্যায়। ক্ষমতা অত্যাচার করে অর্জিত হোক অথবা ন্যায়নীতির দ্বারা—মানবজাতির নেতৃত্বের আসনটা সেই ক্ষমতাসীন জাতি কখনোই হারাতে চায় না।

কিন্তু প্রকৃতি তো আর এমনি এমনি ছেড়ে দেয় না; বরং নতুন কোনো প্রতিযোগীকে এনে মুখোমুখি দাঁড় করায়। পুরোনো পরাশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা এই নতুন পরাশক্তিকে তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি মনে করে। হুমকি মনে না করারও কোনো সুযোগ নেই। কারণ, ক্ষমতার আসন কুক্ষিগত করে রাখার আকাঙ্ক্ষাটা উন্নত যেকোনো জাতির সহজাত বৈশিষ্ট্য। ফলে একপক্ষ অন্য পক্ষকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। তখনই বাধে সংঘর্ষ। হতে পারে বিবাদমান দুটো পক্ষের দুটোই নীতিহীন ও ভ্রান্ত মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবার হতে পারে দুটো পক্ষের একটি নীতিবান, আর অন্যটি মিথ্যার অনুসারী। অর্থাৎ সত্য-মিথ্যার লড়াই।

প্রাথমিক লড়াইটা হয় কথা দিয়ে, নিজেদের পারদর্শিতা প্রদর্শনের মাধ্যমে, মানবজাতির প্রতি কার অবদান কতটুকু আছে সেটা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে, বাণিজ্যিক অবরোধ দিয়ে, একপক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যার নানা অভিযোগ তুলে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিভাষায় এ ধরনের কাজগুলোকে বলা হয় ঠান্ডাযুদ্ধ। এই ঠান্ডাযুদ্ধে দু-পক্ষের কেউই যখন কাউকে পরাস্ত করতে সক্ষম না হয়, তখন ধীরে ধীরে তারা সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়।

দুটো পরাশক্তি সশস্ত্র যুদ্ধে জড়ানোর পূর্বে তাদের মূল কাজটা হলো—যথাসম্ভব চেষ্টা করা, যেন অন্য জাতিগুলোর বেশির ভাগই নিজেদের পক্ষে থাকে। এটা করতে গিয়ে বিবাদমান পরাশক্তি দুটো অন্য জাতিগুলোকে অর্থনৈতিক সুবিধা

দেওয়া থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দুর্বল করে দেওয়ার মতো ভয়ভীতি প্রদর্শন করা, কখনো কখনো মিঠা কথা দিয়ে মন গলিয়ে নিজের দলটা ভারী করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। দল ভারী হওয়ার ব্যাপারটা—অর্থাৎ কে কোন দলে যাবে, সেটা অনেকগুলো পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। যেমন :

১. কিছু জাতি আছে যারা একটু পা চাটা স্বভাবের। এরা আগে থেকেই তোষামোদ করে দুই পরাশক্তির যেকোনো একটিতে যোগ দেয়। এরা বেশ স্বার্থপর। স্বার্থের কারণে এরা রাতারাতি দল বদলে ফেলতে দ্বিতীয়বার ভাবে না।

২. কিছু জাতি থাকে বিশ্বে—যাদের মোটামুটি ক্ষমতা, কিছুটা অর্থনৈতিক প্রভাব, গবেষণা ও আবিষ্কারে অবদান, শিল্প উৎপাদনের দক্ষতা, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা পদ্ধতি থাকলেও তারা দুই মূল পরাশক্তির যেকোনো একটির ছত্রছায়া ছাড়া বিশ্বে তাদের তেমন কোনো প্রভাব নেই। তবে তারা পরাশক্তিদের অতিরিক্ত শক্তি হিসেবে ঠান্ডা ও সশস্ত্র যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এককথায়, এই জাতিগুলোকে পরাশক্তিদের সমমনা জাতি বলা যায়।

৩. কিছু জাতি থাকে যারা ভৌগোলিক দিক থেকে যেকোনো একটি পরাশক্তির কাছাকাছি থাকলেও, ঐতিহাসিক দিক থেকে তারা নিকটবর্তী পরাশক্তির সাথে শত্রুতার কারণে দূরবর্তী পরাশক্তির দলে যোগ দেয়।

৪. কিছু জাতি থাকে যারা পার্শ্ববর্তী কোনো একটা দুর্বল ভূখণ্ড দখল করে নেওয়ার লোভে সেই দুর্বল জাতির শত্রু কোনো পরাশক্তির সাথে যোগ দেয়।

৫. কিছু জাতি থাকে যারা একেবারে সাধারণ; না এদিকে, না ওই দিকে। এই দুর্বল জাতিগুলো ভৌগোলিক দিক থেকে যেই পরাশক্তির কাছাকাছি থাকে, বাধ্য হয়ে সেই পরাশক্তির দলে যোগ দেয়। কখনো কখনো অবশ্য ব্যতিক্রমও ঘটে।

৬. কিছু জাতি থাকে যারা কি না পরাশক্তিদের শিকারে পরিণত হয়। কারণ হিসেবে দেখা যায়, সেই জাতি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় যেকোনো একটা পরাশক্তি তাকে আক্রমণ করে বসেছে। তখন দেখা যায়, অপর পরাশক্তি আক্রমণের শিকার জাতির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সাহায্য করতে চাওয়ার পেছনে সাহায্যকারী পরাশক্তি দেশটির তিনটি কারণ থাকে—

এক. বিনিময়ে আক্রান্ত দেশটিকে সাহায্যকারী পরাশক্তি দেশকে প্রাকৃতিক সম্পদের কিছু ভাগ দিতে হবে।

দুই. বিপক্ষ পরাশক্তিকে প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করতে হবে।

তিন. প্রতিপক্ষ পরাশক্তির সাথে পরোক্ষভাবে দ্বন্দ্বে জড়ানো যাবে।

৭. কিছু জাতি আছে যারা একেবারে জাতপাত ভুলে, ভৌগোলিক আধিপত্যের পরোয়া না করে, শুধু মতাদর্শের অনুসরণ করতে গিয়ে কোনো একটা পরাশক্তির দলে যুক্ত হয়।

পরাশক্তিদের সাথে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে ভিন্ন সমীকরণও থাকতে পারে। তবে এই সাতটিই হলো মূল।

পরাশক্তিরা কোনো একটা দেশ বা ভূখণ্ড সরাসরি দখল না করে সেখানকার অধিকাংশ মগজকে দখল করে নেয়। এক্ষেত্রে পরাশক্তিরা নিজেদের আইনকানুন, নিয়মনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সুকৌশলে সেই দেশ বা ভূখণ্ডে প্রবেশ করায়। তাদের এই কাজটি তারা বাস্তবায়ন করে দুর্বল জাতির কিছু বিশ্বাসঘাতকের মাধ্যমে। বিশ্বাসঘাতকরা সুশীল, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ডাক্তার, বিচারক, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, খেলোয়াড় ইত্যাদি নামে পরিচিত। পরাশক্তিরা নিজেদের অর্থ, শ্রম, মেধা ব্যয় করে কাঙ্ক্ষিত দেশ বা ভূখণ্ডে উক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটা দালালশ্রেণি গড়ে তোলে; যারা সেখানে তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করবে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। এই দালালরা চলনে, বলনে, পোশাকে, সুরতে নিজ জাতির মানুষদের মতোই। তবে চিন্তাচেতনায় এরা প্রভু-পরাশক্তির পা চাটা গোলাম।

এই বিশ্বাসঘাতকদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো– প্রভু-পরাশক্তি কর্তৃক গৃহীত আগ্রাসী পদক্ষেপগুলোকে ইতিবাচকভাবে নিজ জাতির কাছে উপস্থাপন করা। প্রভুরা অবৈধ যা-ই করুক না কেন, সর্বসাধারণের সামনে সেসব কাজের একটা বৈধতা দাঁড় করানো। নিজ জাতিকে তারা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, তারা (পরাশক্তি) যা-ই করছে, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই করছে। এমনকি প্রভুদের দ্বারা অন্য কোনো দুর্বল জাতির ওপর চালানো গণহত্যার পেছনেও এই দালালরা যুক্তি দাঁড় করায়। এমনকি এই বিশ্বাসঘাতক দালালরা যেই ভূখণ্ডের অধিবাসী, প্রভু-পরাশক্তি

যদি কখনো সেটাকেও দখল করে ফেলে, তবুও সেই অবৈধ দখলদারির পক্ষে তারা সাফাই করে প্রভুভক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

মোটকথা, এদের কাজ হচ্ছে একটা কুকুর হয়ে মনিবকে সুরক্ষা দেওয়া। বিনিময় হিসেবে এরা প্রভু-পরাশক্তি থেকে পেট চালানোর পয়সা পায়। কখনো কখনো প্রভুরা নিজ দেশে এদের ডেকে নিয়ে দু-একটা মঞ্চে উঠিয়ে নামে-বেনামে বিভিন্ন পুরস্কার তুলে দেয় হাতে; যেন দুর্বল জাতির সাধারণ মানুষগুলো এটা মনে করে যে, পরাশক্তিরা যেহেতু আমাদের এই মানুষগুলোকে (দালালদেরকে) পুরস্কৃত করছে, তাহলে বোধ হয় তারা সত্যি সত্যিই অনেক গুণধর লোক! যদিও এটা একটা কূটকৌশল; যেন নিজ জাতির সাধারণ মানুষের কাছে এই দালালশ্রেণির একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়। বস্তুত পরাশক্তিরা এই ভৃত্যদের লম্বা সময় নিয়ে নিজেদের জন্য তৈরি করে। এর জন্য প্রয়োজনে প্রভু-পরাশক্তি কর্তৃক নিজ দেশে নিয়ে পিএইচডি করানো, স্কলারশিপ দেওয়া থেকে শুরু করে সকল প্রকারের সুযোগ-সুবিধা এদের দেওয়া হয়।

তবে সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো, এই বিশ্বাসঘাতকরা নিজেদেরকে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়কারী, জনদরদি, মানবাধিকারকর্মী, সমাজকর্মী, নারীবাদী, নিপীড়িতের কণ্ঠস্বর, ত্যাগী মানবসেবক ইত্যাদি পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যেহেতু সমাজে বেইনসাফি থাকে, তাই সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে কথা বলার জন্য কিছু প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন হয়। যেহেতু সমাজে নিপীড়িতের অধিকার আদায়জনিত নানবিধ সমস্যা থাকে, তাই এগুলোর সমাধানের পথ খুঁজতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ভুক্তভোগী হলেও নিজেদের দুর্দশার কথাগুলো তুলে ধরার ভাষা, কৌশল ও সাহস তাদের থাকে না। আর এই সুযোগটাকেই ওই বিশ্বাসঘাতকরা কাজে লাগায়। তারা সাধারণ মানুষের কাতারে এসে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে অধিকারবঞ্চিত মানুষদের বন্ধু বানিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে। হয়তো দু-একটা বিষয়ে তারা সাধারণ মানুষের পক্ষ নিয়ে সত্য বলে; কিন্তু মূল লক্ষ্য থাকে সাধারণ মানুষগুলোকে প্রভুদের অনুগত বানানো।

দুর্বল জাতির কতিপয় পথপ্রদর্শকও এই বিশ্বাসঘাতক দালালশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত থাকে, অন্তর্ভুক্ত থাকে সেই দুর্বল জাতির কতিপয় নীতিনির্ধারক। এমনকি সেই দুর্বল জাতির কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও বর্ণ লুকিয়ে দালালি করে। আর যদি

কোনো দুর্বল জাতির কপাল অনেক বেশি খারাপ হয়, তবে কখনো কখনো সেই দুর্বল জাতির প্রধান শাসকও পরাশক্তির দালালে পরিণত হয়।

এই দালালরা অনেকগুলো কর্মক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে কার্য সম্পাদন করে। প্রত্যেক দালাল নিজ নিজ ক্ষমতাগত ও পেশাগত অবস্থানে থেকে প্রভু-পরাশক্তির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যায়। এটা অনেক সময়সাপেক্ষ ও দীর্ঘ একটা প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে খুব ধীরে ধীরে সুকৌশলে একটা দুর্বল জাতিকে বশে নিয়ে আসা হয়। একটা দুর্বল জাতি ঘুণাক্ষরেও টের পায় না যে–তারা আসলে আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলছে। যার দরুন তারা একসময় অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো–সেই জাতি একসময় নাম-চিহ্নবিহীন হয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই দালালরা নিজ জাতিকে প্রভু-পরাশক্তির দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, নিয়মনীতি, আইনকানুনের সাথে অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করে। তারা সাধারণ মানুষের সামনে জীবনের এমনসব লক্ষ্য তুলে ধরে, এমনসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শেখায়, এমনসব আদর্শে জীবনযাপন করতে বলে, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে প্রভু-পরাশক্তিই লাভবান হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ মনে করে, তারা সঠিক ও আধুনিক জীবনযাপন করছে।

তবে এই দালালদের মূল লক্ষ্য থাকে নিজ জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। কারণ, নতুন মানুষ মানে নতুন মগজ। নতুন মগজ খালি পাওয়া যায়। আর খালি মগজে যা খুশি ঢেলে দেওয়া যায়। এভাবে সময় গড়াতে গড়াতে ওই দুর্বল জাতির অধিকাংশই পরাশক্তিদের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসে পরিণত হয়। তারা আর কখনোই নিজেদের মগজ দিয়ে ভাবতে পারে না। নিজেদের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারে না। নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে চলতে পারে না। ফলে দেখা যায়, যুগ যুগ ধরে মগজধোলাই খাওয়া ওই দুর্বল জাতির সাধারণ মানুষরা সেচ্ছায় পরাশক্তির দৃষ্টিতে সবকিছুকে দেখতে শেখে। পরাশক্তিদের চাওয়াকে নিজেদের চাওয়া বলে মনে করে। পরাশক্তিদের পছন্দ-অপছন্দকে নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেয়। পরাশক্তিদের জীবনযাপনের মতো করে নিজেরা জীবনযাপন করতে চায়; মনে হয় যেন তাদের (দুর্বল জাতির) এবং ওদের (পরাশক্তির) জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একই।

একপর্যায়ে ওই দালালশ্রেণি নিজ জাতির সাধারণ মানুষকে এটা বুঝিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় যে, পরাশক্তিরাই তাদের প্রকৃত অভিভাবক। এবং পরাশক্তিরা তাদের জন্য যা করবে, তাতে তাদের লাভ ছাড়া কোনো লোকসান হবে না।

এক শব্দে এর নাম হলো 'নব্য উপনিবেশবাদ' বা 'Neo-Colonialism'। খুবই কার্যকর এবং এই শতাব্দীতে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত একটি পন্থা। অত্যাচারী উপনিবেশবাদীরা আগে নিজেরাই শাসক হয়ে দুর্বল কোনো জাতিকে শোষণ করত। আর এখন তারা দুর্বল জাতি থেকে কিছু লোককে বেছে নিয়ে উচ্ছিষ্টভোগী একান্ত অনুগত দালাল বানিয়ে, তাদেরকে দিয়ে ওই দুর্বল জাতিকে পরোক্ষভাবে শোষণ করে।

এই পদ্ধতিতে ফায়দা হাসিল হয় সবচেয়ে বেশি। কারণ, অধিকাংশ মানুষের রয়েছে সূক্ষ্মদর্শিতা এবং বিচার-বিশ্লেষণক্ষমতার অভাব। ফলে তারা বাহ্যিকভাবে যা ঘটতে দেখে, সেটাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে; অন্তরালের আসল ঘটনা তারা উপলব্ধি করতে পারে না।

প্রথম ফায়দা : দুর্বল হোক অথবা সবল, স্বাভাবিকভাবেই মানুষ স্বাধীনচেতা। তাই অন্য জাতির, অন্য চামড়ার, অন্য ভাষার কাউকে নিজেদের ওপর কর্তা বা নীতিনির্ধারক বা পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিতে কেউই চাইবে না। সুবিচার পেলে সেটা ভিন্ন কথা। নিজেদের চামড়ার লোকদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াটাকে মানুষ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখে। ভাবে–বুদ্ধিবৃত্তিক কলাকৌশল যা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা তো আমাদের নিজেদের লোকদের মগজ নিংড়ানো। অথচ বাস্তবতা হলো–এই দালালরা প্রভুদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। বিশ্বাসঘাতক এই দালালশ্রেণি নিজেরা যা-ই করে এবং নিজ জাতিকে করতে বলে, এর পেছনে উদ্দেশ্য থাকে প্রভু-পরাশক্তির স্বার্থ হাসিল করা। যেন ভবিষ্যতে এই ভূখণ্ডকে ঘিরে প্রভুদের কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এখানকার সাধারণ মানুষ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

অর্থাৎ, শিকারকে তারই মতো কাউকে দিয়ে বাগে নিয়ে আসা; যেন শিকার কোনো ক্রমেই আঁচ করতে না পারে। এককথায় যেটাকে বলে–পোষা ঘুঘু দিয়ে বুনো ঘুঘু শিকার।

দ্বিতীয় ফায়দা : কোনো প্রকার রক্তারক্তি ছাড়াই গোটা একটা জাতিকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। একটা জাতিকে মেধার দাসত্ব করাতে পারলে শারীরিক দাসত্বটা সহজেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে অন্য কোনো দুর্বল জাতির প্রতি পরাশক্তি কর্তৃক যেকোনো অবৈধ পদক্ষেপকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দাসে পরিণত হওয়া দুর্বল জাতির অধিকাংশ মানুষ সমর্থন করে। অন্য কোনো দুর্বল জাতি পরাশক্তির দ্বারা আক্রমণের শিকার হলে মেধার দাসত্বের শিকলে বন্দি দুর্বল জাতি সেটার বিরোধিতা করে না; বরং পক্ষাবলম্বন করে। এমনকি শাসক-সংশ্লিষ্ট নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানেও দুর্বল জাতির অধিকাংশ মানুষ পরাশক্তির হস্তক্ষেপ কামনা করে। আর এটাই হলো পরাশক্তির মোক্ষম হাতিয়ার। সমস্যা সমাধানের নাম করে সেই দুর্বল জাতির ওপর চাপিয়ে দেয় নতুন শাসক নামক এক দালালকে। সাধারণ মানুষ তো মনে করে, বোধ হয় সবকিছুই ঠিকঠাকমতো চলবে এখন থেকে। বস্তুত নিজ স্বাধীন দেশ বা ভূখণ্ডটা যে পরোক্ষভাবে পরাধীন হয়ে গেল, সেটা তারা টেরই পায় না। টের পায় বটে; তবে তখন বড্ড দেরি হয়ে যায়। তা ছাড়া কোনো স্বাধীন ভূখণ্ড দখলে নিতে চাইলে সেখানে সামরিক আক্রমণ ব্যয়বহুল, ক্ষয়ক্ষতি ও হাঙ্গামা বেশি হয়। ফলে পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি হয় বেশি। এতে করে পরাশক্তিদের অপকর্মগুলো সবার দৃষ্টিগোচরে চলে আসে। নিন্দার ঝড় শুরু হয়। তাই দালাল দিয়ে কোনো দুর্বল জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করাটা বেশ নিরাপদ।

অর্থাৎ, লুঙ্গি না ভিজিয়ে মাছ ধরা। এককথায় যাকে বলে—ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

বিজিত জাতির অনুকরণ করার সাধ মনে জাগতেই পারে। যেহেতু প্রতিটি জাতির কিছু না কিছু ভালো দিক থাকে। তাই বিজিত জাতির কাছ থেকে ভালো কিছু গ্রহণ করাটা দোষের কিছু নয়। মানবতার কল্যাণে খারাপকে বর্জন এবং ভালোকে গ্রহণ করার পারস্পরিক এই আদান-প্রদান হতেই পারে। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় অন্ধের মতো অনুসরণ ও অনুকরণ করলে। উপরন্তু, অন্য জাতির অসুস্থ সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতি মনে করে সেটার চর্চা করা তো আরও ভয়াবহ রোগের লক্ষণ। এ এক করুন বাস্তবতা! একটা দুর্বল জাতি টেরই পায় না যে, তারা গোটা একটা জাতি অপহৃত হয়ে গেছে। তারা অন্য জাতির চালচলনকে নিজেদের চরিত্র মনে করে নিশ্চিন্তে পথ চলে। ভাবে—এটাই আমাদের আত্মপরিচয়। আরে নিজেদের বৈশিষ্ট্যও যদি মনুষ্যত্বের সাথে অসামঞ্জস্য হয়, তবে সেটাও তো বর্জনীয় হওয়া উচিত। অথচ অন্য জাতির কুস্বভাব, কু-অভ্যাস, কুচরিত্রকে চরিতার্থ করতে কী এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা!

'দালালশ্রেণি' তৈরির সফলতা মূলত এখানেই। এই প্রভুভক্ত ভৃত্যরাই নিজ জাতির সাথে এই বিশ্বাসঘাতকতাটা করে। দুর্বল জাতির সাধারণ মানুষগুলো নিজেদের পথচলার পাঞ্জেরী হিসেবে এই দালালশ্রেণির দিকে তাকিয়ে থাকে। আর এই দালালশ্রেণিটা এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের গোটা একটা জাতিকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। নিজেদের রংকে বদলে দিয়ে অন্যের রঙে রঞ্জিত হতে শিখিয়ে বলে—এটাই তোমাদের আসল রং।

এখানে ভিন্ন আরও একপ্রকারের দালালশ্রেণির ব্যাপারে বলে রাখাটা সংগত মনে করছি। পরাশক্তিরা এই দালালশ্রেণিটাকে তৈরি করেছে অন্য দুর্বল জাতি থেকে নয়; বরং নিজের জাতি এবং নিজেদের সমমনা অন্যান্য জাতির সমন্বয়ে। শুরুর দিকে পরাশক্তিদের বিভিন্ন জাতির সাথে সম্পর্ক তৈরির সাতটি সমীকরণ দেখিয়েছিলাম। সেখানে ২য় সমীকরণে যেই জাতিগুলোর কথা তুলে ধরেছিলাম, এটা সেই সমমনা জাতিগুলোর কথাই বলছি। এই ভিন্ন রকমের দালালশ্রেণিটা প্রভু-পরাশক্তিদের পক্ষে সারা বিশ্বে এদের দালালি কার্যক্রম পরিচালনা করে বিধায় এদেরকে 'আন্তর্জাতিক দালাল' বলে অভিহিত করাটাই যথোচিত হবে। অন্যভাবে বললে—এই আন্তর্জাতিক দালালশ্রেণিটা পরাশক্তিদের ঠান্ডাযুদ্ধের একেবারে সম্মুখভাগের সৈনিক।

তাহলে ঘটনা দাঁড়াল—দালালশ্রেণি দুটি; একটি আন্তর্জাতিক, অপরটি আঞ্চলিক। এই আন্তর্জাতিক দালালদের আবার দুটো অংশ। একটি হলো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম, অপরটি হলো আন্তর্জাতিক এনজিও।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো হলো পরাশক্তিদের প্রত্যক্ষ দালাল। অন্যভাবে বললে—এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরাশক্তিদের দালাল না বলে বলা উচিত—এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরাশক্তিদের নিজেদেরই কার্যালয়। সহজভাবে বললে, রাজা তার রাজ্যের জন্য যেই আদেশ জারি করে, সেটা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য একজন ঘোষণাকারী থাকে। আবার রাজ্যের খবরাখবর রাজা পর্যন্ত পৌঁছানোরও লোক থাকে। সংবাদমাধ্যম সে রকমই একটা বিষয়। রাজার উক্ত আদেশ কৌশলে বাস্তবায়নকারী দলটাই হলো এনজিওগুলো। কৌশলী দল দিয়ে যখন কোনো কাজ না হয়, তখন রাজার লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে বলপ্রয়োগে উদ্দেশ্য হাসিল করা হয়। এই লাঠিয়াল বাহিনীই হলো বর্তমান যুগের

সামরিক বাহিনীগুলো। এই সামরিক বাহিনীগুলোকে কি আপনারা পরাশক্তিদের থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করেন? উত্তর হলো–'না'।

সুতরাং সামরিক বাহিনী যেমন পরাশক্তিদের নিজেদেরই গোলাম, একইভাবে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোও পরাশক্তিদের নিজেদের গোলাম। পরাশক্তিরাই এদেরকে নিজেদের জন্য তৈরি করে। এদের পেছনে মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে। পার্থক্য হলো, সামরিক দালালশ্রেণির সাথে পরাশক্তিরা প্রকাশ্য সম্পর্ক বজায় রেখে চললেও, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মতো বেসামরিক দালালশ্রেণির সাথে পরাশক্তিরা তাদের সম্পর্কটা সরাসরি রক্ষা করে চলে না। কিছুটা ঘুরিয়ে এমন একখানা ভাব নেয় যে, মনে হয় এসব বেসামরিক কার্যালয়গুলোর সাথে পরাশক্তিদের কোনোই সম্পর্ক নেই; কার্যালয়গুলো একেবারে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ।

এমন কূটকৌশল অবলম্বন করার কারণ হলো–যেন বিশ্বের সাধারণ মানুষ মনে করে যে, এই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো তাদের উপকারে তাদেরই পক্ষ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছে।

সারকথা হলো, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে পরাশক্তিরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ব্যাকডোর দিয়ে সরাসরি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে।

এখন বলতে পারেন, 'আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে তো দেখা যায় পরাশক্তিদের সমালোচনা করতে। মনিবের বিরুদ্ধে চাকর এত বড়ো সাহস পায় কীভাবে?'

প্রথমত, আপনার কথাটা সত্য। তবে এটা ওদের কৌশলেরই একটা অংশ। যেন আপনার মতো সাধারণ মানুষগুলোর মনে এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে একটা আস্থা জন্মায়। যেন আপনারা ঘুণাক্ষরেও টের না পান যে, এখানে আসলে সব ওরা ওরাই। সুতরাং চাকররা যা করে, সেটা ওদের মালিকের অনুমতিতেই করে। মালিকই চাকরকে এমনটা করতে আদেশ দিয়ে রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, ভৃত্যগুলো এমন এমন বিষয়ে প্রভুদের বদনাম করে, যেগুলো মূলত ছোটখাটো বিষয়। এর চেয়েও অনেক বড়ো বড়ো কুকীর্তি ওদের প্রভুরা করে।

বস্তুত ওরা প্রভুদের বড়ো অপরাধগুলো আড়াল করার জন্যই ছোটো অপরাধগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। কখনো কখনো অপরাধের মাত্রা কমিয়ে প্রচার করা হয়, যেন অন্য কোনো উৎস থেকে সত্যটা প্রকাশ পেয়ে গেলে ওদের (আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক এনজিও) গায়ে পক্ষপাতদুষ্টতার তকমা না লাগে। কখনো কখনো প্রভুদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষগুলোকে উলটো বড়ো অপরাধী বানিয়ে এবং প্রভুদের কৃত অপরাধের পক্ষে যুক্তি পেশ করে সেটাকে ছোটোখাটো অপরাধ হিসেবে উপস্থাপন করে এই আন্তর্জাতিক দালালরা।

এখন কিছু কথা বলব। আমার কথাগুলোর সাথে একমত হওয়ার জন্য আপনার গলায় চাকু ধরব না। দ্বিমত পোষণ করার পুরোপুরি স্বাধীনতা আপনার থাকবে। তবে দ্বিমত পোষণকারীদের অনুরোধ করব–কিছু সময়ের জন্য আমার দৃষ্টিতে পরবর্তী বিষয়গুলোকে অবলোকন করে দেখুন, টোটায় টোটায় ঘটনাগুলো মিলে যায় কি না। আমার মতো করে ভাবতে তো আর গাঁটের পয়সা খরচ করতে হবে না আপনাদের। সামান্য কিছু সময় ব্যয় হবে শুধু। জীবনে একটু বিনোদন পাওয়ার জন্য কত কিছুই তো করেন। আমার সম্পূর্ণ কথা শোনার পর যদি কথাগুলোকে ভিত্তিহীন মনে হয়, তখন ধরে নেবেন–বিনোদনের জন্য খানিকটা সময় উদ্ভট এক ভাবনার জগতে কাটিয়েছেন। মনে মনে এটা বলেই সাথে সাথে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিরে চলে আসবেন। ব্যস হয়ে গেল।

কারিম শাওন

শান্ত প্রকৃতিতে অশান্তি

বিড়াল কোনো জায়গা দিয়ে ওর মাথাটা ঢোকাতে পারলে পুরো শরীর ঢুকিয়ে দিতে পারে; এখন সেটা যত ছোটো জায়গাই হোক।

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকাগুলো বিশাল বিশাল পাহাড়ে ঘেরা এবং অত্যন্ত দুর্গম। শুধু সীমান্তেই না; পাহাড়ি এলাকা উভয় দেশের আরও ভেতর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশেষ করে মিয়ানমার দেশটা প্রায় পুরোটাই পাহাড়ি। পাহাড়ি এলাকায় যারা গিয়েছেন, তারা জানেন–পাহাড়ি বন-জঙ্গল কতটা দুর্গম হয়। উভয় দেশের দক্ষিণের পাহাড়গুলোর শেষটা এসে মিলেছে বঙ্গোপসাগরের সাথে। মাইলের পর মাইল উপকূলীয় এলাকা জনশূন্য। কোথাও দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত। কোথাও পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে। কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ দিয়ে যারা টেকনাফ জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন, তারা আমার কথাগুলো খুব সহজে অনুধাবন করতে পারবেন। তা ছাড়া মিয়ানমারের সাথে চীন, ভারত ও থাইল্যান্ডের এবং বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমার ও ভারতের রন্ধ্রবহুল পাহাড়ি সীমান্ত তো আছেই।

উভয় দেশের সেনাবাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিজেদের পাহাড়ি এলাকা এবং উপকূলীয় এলাকাসহ প্রতি কিলোমিটার সমুদ্রসীমা নখদর্পে রাখতে পারে না। রাখা সম্ভবও না। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় নিশ্ছিদ্র নজরদারি রাখার জন্য এই দুটো উন্নয়নশীল দেশের তেমন আধুনিক প্রযুক্তি নেই।

তাই খুব সহজে এসব জায়গাগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলোকে পেলে পুষে রাখা যায়। ভৌগোলিক সুবিধা পেয়ে এই অঞ্চলগুলো সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ি ও সমুদ্রপথে খুব সহজেই এদের কাছে এদের পৃষ্ঠপোষকরা অস্ত্র-গোলাবারুদসহ আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে। এদের দিয়ে যেকোনো একটা দেশের ভেতরে বড়ো রকমের অরাজকতা সৃষ্টি করা যায়।

যেমন : বাংলাদেশের ভেতরে আছে JSS, JSS (সংস্কারপন্থি), UPDF, UPDF (গণতান্ত্রিক), KNF, মগ পার্টিসহ ৬/৭টি উপজাতি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী।

মিয়ানমারের ভেতরে আছে AA (আরাকান আর্মি), KIA, KNLA, MNLA, PDF, SSAN, SSAS, UWSA, ZRA, NDAA ইত্যাদি। মিয়ানমারের

ভেতরের এই দলগুলোর সবই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী না। বেশ কয়েকটা স্বাধীনতাকামী দল আছে। এরা কম করে হলেও অর্ধশত বছর যাবৎ সংগ্রাম করছে। আর কিছু আছে ভুঁইফোড়; বাংলাদেশের উপজাতি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর মতো। এদের নিজস্ব কোনো ভিশন ও মিশন নেই। কারও উসকানিতে অস্ত্র নিয়ে নেমেছে। এরা ৩/৪ শত বা হাজারখানেক সদস্য নিয়ে নির্দিষ্ট একটা পাহাড়ি অঞ্চল নিজেদের দখলে রাখতে চায়। একটা স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করতে এবং এটাকে টিকিয়ে রাখতে ভৌগোলিক কী কী উপাদান বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, সেসব ব্যাপারে এই ভুঁইফোড় দলগুলোর কোনো ধারণা নেই বললেই চলে।

অতিরিক্ত আরেকটু বলে রাখি। পরবর্তী আলোচনার কিছু কিছু জায়গায় এগুলো সহায়ক হবে।

স্বাধীনতাকামী ভারতেও আছে।

মিজোরাম : ZRA, KNA, MNF

মনিপুর : UNLF, PLA, PREPAK, KCP

নাগাল্যান্ড : NSCN, NSCN-K

ত্রিপুরা : NLFT, ATTF

আসাম : NDFB, ULFA (উলফা), KLO

মেঘালয় : HNLC, GNLA

এদিকে ভারতের পূর্ব দিকের সেভেন সিস্টার্সের মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুনাচল প্রদেশগুলোর সাথে মিয়ানমারের পশ্চিম দিকের চিন, সাগায়িং ও কাচিন প্রদেশগুলোর সীমান্ত আছে। এই প্রদেশগুলোর প্রত্যেকটা বিশাল বিশাল পাহাড়ে (১৫ হাজার ফিট উচ্চতা পর্যন্ত পাহাড়ও আছে) ঘেরা এবং অত্যন্ত দুর্গম এলাকা।

ভারত ও মিয়ানমারের কিছু কমন এনিমি আছে।

যেমন : ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (NSCN) নামে স্বাধীনতাকামী একটা সশস্ত্র গোষ্ঠী আছে, যারা কিনা ভারতের নাগাল্যান্ড ও মিয়ানমারের সাগায়িং প্রদেশ দুটোকে স্বাধীন করে নাগা জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করতে চায়। ইতোমধ্যে মিয়ানমারের সীমারেখার ভেতরে সাগায়িং প্রদেশের কিছু অঞ্চলে এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

আরও যেমন : মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (MNF), চিন ন্যাশনাল আর্মি (CNA), কুকি ন্যাশনাল আর্মি (KNA), জোমি রেভোলুশনারি আর্মি (ZRA) নামে স্বাধীনতাকামী চারটি সশস্ত্র গোষ্ঠী আছে, যারা কিনা ভারতের মিজোরাম, মনিপুর, ত্রিপুরা, আসাম প্রদেশ এবং মিয়ানমারের রাখাইন, চিন, সাগায়িং প্রদেশ; বাংলাদেশের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার অঞ্চলগুলো নিয়ে 'জোগাম স্টেট' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। এই 'জোগাম স্টেট' আয়তনে বাংলাদেশের থেকেও বড়ো। এরা মূলত 'জো জনগোষ্ঠী'। ভারতের মিজোরাম প্রদেশের মিজো জনগোষ্ঠী এবং মিয়ানমারের চিন প্রদেশের কুকি-চিন জনগোষ্ঠী মূলত একই জনগোষ্ঠী। এদের বংশধারা ও সংস্কৃতি একই। '৪৭-এ দেশ ভাগের সময় এই জনগোষ্ঠীটিকে বাধ্যতামূলকভাবে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে এক অংশকে ভারতের অধীনে যেতে হয়, আরেক অংশ যায় মিয়ানমারের অধীনে। এই চারটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর লক্ষ্য হলো 'জো জনগোষ্ঠী'-কে একত্র করা।

কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠী শুধু নিজ দেশের সেনাবাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত। কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠী সীমান্তের দুই পাশের দুই দেশের সেনাবাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত। কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠী নিজের দেশ ও অন্য দেশের সশস্ত্র গোষ্ঠীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত। পাশাপাশি ভারত ও মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বাংলাদেশের কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠীকে আশ্রয়, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করে। আবার চীনের সেনাবাহিনী ভারত ও মিয়ানমারের কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠীকে আশ্রয়, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করে। আবার বাংলাদেশের সেনাবাহিনী মিয়ানমারের দু-একটা সশস্ত্র গোষ্ঠীকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করে।

অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের লাখ লাখ বর্গকিলোমিটারের পাহাড়ি অঞ্চলগুলো অনিরাপদ। খুবই নাজুক একটা পরিস্থিতিতে আছে। যুদ্ধের আগুন একদিক থেকে লাগলে তা দাউদাউ করে এই তিনটা দেশের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে।

(এই তিন দেশের পাহাড়ি অঞ্চল প্রসঙ্গ আপাতত এ পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গটা নিয়ে শেষের দিকের পর্বে আবারও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব। সেখানে রোহিঙ্গা ইস্যুটাও উঠে আসবে, ইনশাআল্লাহ। তিন দেশের মানচিত্রগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন। এতে করে লেখা বুঝতে এবং হিসাব মেলাতে সহজ হবে। বিশ্ব মানচিত্র সম্পর্কে ধারণা থাকা খুব খুব দরকার।)

পূর্ণিমা রাতের অমাবস্যা

কক্সবাজারে একা ভ্রমণ করার মজা এক্কেবারে আলাদা। প্যারা দেওয়ার কেউ থাকে না। পুরাই চিল। যেখানে খুশি ঘুরতে যাওয়া যায়। মনে চাইলে খাই, না মনে চাইলে না খাই। যখন ইচ্ছে ঘুমাই, যখন ইচ্ছে ঘুম থেকে উঠি। যতক্ষণ পায়ে কুলায় নিরিবিলি সৈকত দিয়ে হেঁটে ভবিষ্যৎ-বউয়ের জন্য (যদি কপালে প্রকৃত দ্বীনদার বউ থাকে আরকি) শামুক-ঝিনুক কুড়াই। আধা কেজির মতো জমিয়েছি। সাগরের কোলঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে দেখা যায় ১/১.৫ কিলোমিটার হেঁটে ফেলেছি। জোয়ারের সময় একবার হাঁটি। আবার ভাটার সময় একবার হাঁটি। দু-তিন ঘণ্টার জন্য আরামকেদারা ভাড়া নিয়ে রাত প্রায় ৩/৪টা পর্যন্ত সৈকতে বসে থাকি। ওই সময়ে সৈকতটা একটু নিরিবিলি থাকে। আমার আবার তারা দেখার ভীষণ রকমের নেশা। সাথে সমুদ্রের ঢেউ, খোলা আকাশ, উত্তাল বাতাস। পূর্ণিমার চাঁদ থাকলে ষোলোকলা পূর্ণ হয়। সুবহানাল্লাহ, কী মনোরম দৃশ্য!

এমনই ২০১৯ সালে একবার একা কক্সবাজার গেলাম। এর আগে গিয়েছি তিনবার, পরে একবার; এই মোট পাঁচবার। কক্সবাজার এলাকাটা মোটামুটি আমার মুখস্থ। তো, একরাতে সমুদ্রসৈকতে আরামকেদারা ভাড়া করে বসে আছি। সুগন্ধা বীচের এদিকটায়। রাতের বেলা এদিকটা নিরাপদ। অল্পস্বল্প পর্যটক থাকে। ট্যুরিস্ট পুলিশদের আনাগোনাও থাকে। তখন আনুমানিক রাত প্রায় দুইটা। হঠাৎ দেখি হাতের বাম দিক–মানে কলাতলি বীচের দিক থেকে সাদা রঙের তিনটা গাড়ি সৈকতের ওপর দিয়ে চালিয়ে আসছে। গাড়িগুলো দৃষ্টির আরও কাছে আসলে দেখতে পেলাম, সবগুলোই ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো গাড়ি এবং গাড়িতে জাতিসংঘের লোগো। গাড়িগুলো আমার সামনে দিয়ে হাতের ডান দিক–মানে লাবনী বীচের দিকে চলে গেল। রোহিঙ্গাদের আশ্রয়কেন্দ্রের এলাকা থেকেই গাড়িগুলো এসেছে বুঝলাম। মানে উখিয়া থেকে ফিরে কলাতলির ডলফিন মোড়ে এসে মূল সড়ক দিয়ে কক্সবাজার ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দিকে না গিয়ে কলাতলি বীচে নেমে সোজা লাবনী বীচে গিয়ে এরপর আবার মূল সড়কে উঠবে। লাবনী বীচের পাশেই কক্সবাজার ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

মনে মনে ভাবলাম, একটু চিল করার জন্য এমন করেছে হয়তো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, এত রাতে এই আন্তর্জাতিক এনজিওকর্মীরা উখিয়ার দিকে কী করছিল। কারণ, ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা, শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান, চিকিৎসা দেওয়া ইত্যাদি তো দিনের বেলার কাজ। মেজর সিনহাকে কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের যেই রাস্তায় হত্যা করা হয়; তখন দেখেছেন, সন্ধ্যা হলেই ওই এলাকাগুলো কেমন জনমানবহীন হয়ে যায়। গা ছমছম করে। সেই হিসেবে টেকনাফ, উখিয়া, কুতুপালং ইত্যাদি এলাকাগুলোর রাত দুইটা মানে অনেক গভীর রাত। আকাশ থেকে পরিরা নেমে এসে নিশ্চিন্তে নৃত্য করতে করতে সাগরে স্নান করতে পারবে–এমনই নীরব।

কক্সবাজার ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ঠিক পাশেই UNHCR তথা জাতিসংঘের একটা বাসভবন আছে। আগে জানতাম না। তৃতীয়বার যখন কক্সবাজার গেলাম, তখন চলতি পথে হঠাৎ চোখে পড়ল। রিকশায় চড়ে যেতে যেতে বাইরে থেকে যেটুকু দেখলাম–সম্পূর্ণ বাসভবনটা উঁচু দেওয়ালে ঘেরা, দেওয়ালের ওপরে মজবুত কাঁটাতারের বেড়া। সদর দরজা বন্ধ। দরজাটাও সলিড স্টিলের। কোনো ফাঁকফোকর নেই যে, ভেতরের কিছু চোখে পড়বে। বুঝলাম, খুব রেস্ট্রিকটেড বাসভবন। নিরাপত্তার ধরন দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম। মনে মনে বললাম, একটা চ্যারিটেবল অরগ্যানাইজেশনের এত কীসের গোপনীয়তা। তা ছাড়া UNHCR-এর কাজই তো হলো রিফিউজিদের নিয়ে।

যাহোক, আন্তর্জাতিক এনজিওকর্মীরা ওই বাসভবনে থাকে। সবাই না। এদের সংখ্যা অনেক। বেশির ভাগ থাকে সুগন্ধা বীচের পাশে থ্রি স্টার হোটেলগুলোতে। আমি যেটায় ছিলাম, এর আশেপাশের বিশেষ বিশেষ কিছু হোটেলের গ্যারেজে ওদের লোগোসংবলিত গাড়ি পার্ক করা দেখতে পেতাম। ওগুলো ৩/৪ রুমের ফ্ল্যাটবিশিষ্ট হোটেল। কয়েক মাসব্যাপী ভাড়া নেওয়া যায়। আমি হোটেল থেকে রাস্তায় নামলেই দেখতাম, একটু পরপর রোহিঙ্গাদের ওদিকে UN, USAID, Red Cross, WFP, UNFPA, FAO, UNDP, UNHCR, HRC-এর গাড়ি যায়, আবার কিছু গাড়ি ওদিক থেকে ফিরে আসে। সারাদিন ধরে চলে এসব। এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত। বুঝলাম, রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে তারা খুব তৎপর।

রাখঢাক না রেখে সরাসরি একটা কথা বলি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম যেমন : 'বিবিসি', 'রয়টার্স', 'গার্ডিয়ান', 'সিএনন', 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস', 'আল-জাজিরা'; আন্তর্জাতিক এনজিও যেমন : হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, রেড ক্রস, রেড ক্রিসেন্ট; জাতিসংঘ, জাতিসংঘের অধীনস্থ সংস্থা যেমন : ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউএনএইচসিআর, ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ; আন্তর্জাতিক নারীবাদী সংগঠন, আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন, আন্তর্জাতিক অ্যানিমেল রাইট অর্গানাইজেশন—সবগুলো সংস্থাই আমেরিকা ও ইউরোপের পোষ্য। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই সংস্থাগুলো সাহায্য-সহযোগিতা করে বটে, তবে এটা তাদের মূল উদ্দেশ্য না। মূল উদ্দেশ্য হলো—আমেরিকা ও ইউরোপের পারপাস সার্ভ করা। এই সংস্থাগুলোর মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা হলো কলুর বলদ। এরা ভেতরগত বিষয়ে অতটা অবগত না। মোটা অঙ্কের বেতনের বিনিময়ে ঘানি টেনে ঘাম ঝরানো পর্যন্তই এদের কাজ। তবে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একেবারে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিভিন্ন দেশের—বিশেষ করে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পৃক্ত থাকে। কেউ কেউ ছদ্মবেশী কূটনীতিক হয়ে কাজ করে। কেউ কাজ করে গোয়েন্দা হয়ে। কেউ কাজ করে সামাজিক অস্থিতিশীলতার উসকানিদাতা হিসেবে।

কোনো রাষ্ট্রের সরকার যদি এই সংস্থাগুলোর প্রভুদের অনুগত না হয়, তখন এই সংস্থাগুলো উক্ত রাষ্ট্রের সরকারের সাথে প্রভুদের সমঝোতা করিয়ে দেয়। সরকারি দলটির ক্ষমতায় টিকে থাকা নিয়ে পরোক্ষভাবে দেনদরবার করে। সরকারপ্রধানদের কাছে প্রভুদের নির্দেশমতো প্রস্তাবনা ও শর্ত পেশ করে। রাষ্ট্রের মিরজাফরদের খুঁজে বের করে কিছু পয়সা-কড়ির বিনিময়ে সরকারবিরোধী হিসেবে প্রভুদের কাজে লাগায়। সরকারবিরোধীদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অর্থসহায়তা দেয়। আরও যেমন—সোশ্যাল ওয়ার্কিংয়ের নামে একটা জাতির নির্দিষ্টসংখ্যক তরুণকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রভুদের অনুগত বানায়, শিক্ষাদান কর্মসূচির আড়ালে একটা জাতির ভেতরে প্রভুদের মতাদর্শ ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটায়, বড়ো অংকের অর্থ ও তথ্য সহায়তার দ্বারা সমকামিতা ও অশ্লীলতার মতো গর্হিত অপরাধগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে একটা রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা ভেঙে দেয়, নারীশিক্ষা ও নারীদের কর্মসংস্থানের নামে পারিবারিক আদর্শের ছায়াতল থেকে নারীদের বাহিরে বের করে আনে, তথাকথিত বাল্যবিবাহ বন্ধ করে উলটো ছেলে-

মেয়েদের অবাধ মেলামেশাকে প্ররোচিত করে একটা জাতির মধ্যে জিনা-ব্যভিচারের বিস্তৃতি ঘটায়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে বিনামূল্যে জন্মবিরতিকরণ পিল বিতরণ করে মুসলিমদের জন্মহার কমিয়ে আনে ('দুটি সন্তানই যথেষ্ট' এসব শয়তানি স্লোগান এই এনজিওগুলোর শেখানো।) ইত্যাদি। তাই আমার বিবেচনায় এই সংস্থাগুলো আমেরিকা ও ইউরোপের আনআর্মড মিলিটারি উইং।

উদাহরণস্বরূপ, বছর দুয়েক আগে ভেনেজুয়েলায় সরকারবিরোধী আন্দোলনকারীদের কঠোরভাবে দমন করা হয়। সরকার দলীয়রা হলো আমেরিকা ও ইউরোপ বিমুখ, তবে চীনঘেঁষা। তাই সরকারবিরোধীদের জন্য আমেরিকা ও ইউরোপ মায়াকান্না শুরু করে। ভেনেজুয়েলার সরকার উৎখাত করতে হলে আমেরিকা ও ইউরোপের গোয়েন্দা ও এজেন্টদের ভেনেজুয়েলার অভ্যন্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এরা ভেতরগত তথ্য সংগ্রহ করবে, নতুন নতুন ইস্যু তুলে উসকানি দেবে, গুজব রটাবে, সরকারবিরোধীদের দিকনির্দেশনা দেবে, মানবাধিকার লঙ্ঘন করার বিষয়টা সামনে এনে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে। সব কাজ আমেরিকা ও ইউরোপের ভেনেজুয়েলান দালাল দিয়ে সম্ভব হবে না। নিজস্ব লোক দরকার। অর্থাৎ, আমেরিকা ও ইউরোপ যেহেতু সরাসরি নিজেদের গোয়েন্দা বা এজেন্টদের ভেনেজুয়েলায় পাঠাতে পারছে না, তাই এই সংস্থাগুলোর ছদ্মবেশে পাঠাতে হবে। তারা হিউম্যানিটেরিয়ান এইড দেওয়ার নামে ভেনেজুয়েলায় প্রবেশ করবে। আই ওয়াশ হিসেবে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ, প্রাথমিক চিকিৎসা, পোশাক, তাঁবু, এমনকি স্যানিটারি ন্যাপকিন পর্যন্ত দেবে। এগুলো আমেরিকা ও ইউরোপের জাতীয় বাজেটেরই অংশ।

এসব বুঝেই ভেনেজুয়েলা এই এনজিওগুলোকে তখন ভেনেজুয়েলাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। এটা নিয়ে আমেরিকা ও ইউরোপ ওদের আরেকটি পোষ্য : গণমাধ্যমগুলোকে দিয়ে নতুন মাত্রায় প্রোপাগান্ডা চালিয়ে ভেনেজুয়েলান এবং বিশ্বের উজবুক টাইপের জনগণকে দ্বিগুণ ক্ষেপিয়ে তোলে। তাৎক্ষণিকভাবে ভেনেজুয়েলা চীনের কাছ থেকে হিউম্যানটেরিয়ান এইড নিয়ে জনগণের অ্যাংরি সেন্টিমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করেছিল, তবুও এনজিওগুলোকে ঢুকতে দেয়নি।

মিরজাফর, থুক্কু স্যার জাফর ইকবালের ভাষায় বললে–আপনারা জেনে অবাক হবেন, এই এনজিওগুলো ভারতের অরুনাচল (৩০%), মেঘালয় (৭৪%), মনিপুর (৪১%), মিজোরাম (৮৭%), নাগাল্যান্ড (৮৮%) এবং মিয়ানমারের চিন (৮৫%) প্রদেশের অধিকাংশ নাগরিককে খ্রিষ্টান বানিয়ে ফেলেছে। এসব প্রদেশে খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীরা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। আগে এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। আমার এই কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করার আগে একটু ভাবুন তো, বাংলাদেশের গহিন পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে চার্চগুলোর ফাদাররা গিয়ে গিয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার করেছিল কি না? উত্তর হলো–না। তাহলে এ কাজটা কারা করল? এত বিস্তৃতভাবে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের আহ্বান এরা কীভাবে পেল? উত্তর হলো–ওই আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো হিউম্যানিটেরিয়ান এইডের নামে পাহাড়ি অঞ্চলের প্রতিটি কোনায় কোনায় ঢুকে দরিদ্র উপজাতিদের অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করেছে। যাহোক, আমার আলোচনার প্রসঙ্গ এটা না।

আন্তর্জাতিক এই সংস্থাগুলোর সাথে আমেরিকা ও ইউরোপের সম্পর্কের রসায়নটা অত্যন্ত কৌশলে সাধারণ মানুষের চোখ থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রভু ও ভৃত্য কীরূপে একে অপরকে সাহায্য করে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের কাছে সেটা বোধগম্য হয় না। এমনকি অধিকাংশ সাধারণ মানুষ আন্দাজই করতে পারে না যে, এই সংস্থাগুলো পরাশক্তিদের ফুট সোলজার। দাস ও মনিব এমনভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে যে, দেখে মনে হয় তাদের মধ্যে কোনো প্রকার সম্পর্কই নেই। অথচ লেজের সাথে কুকুরের যেমন সম্পর্ক, এই চাকরদের সাথে তাদের মালিকদেরও তেমনই সম্পর্ক। কুকুরের ইচ্ছেতে যেমন লেজ নড়ে, পরাশক্তিদের ইচ্ছাতে এই সংস্থাগুলো কাজ করে।

ব্যাপারটা এমন নয় যে, এরা অগোচরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করে; বরং যা করার প্রকাশ্যেই করে। শুধু নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টাকে আড়াল করে রাখে। ব্যাপারটা অনেকটা এ রকম যে, কুকুর তার নিজের লেজকে নিজ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে দাবি করে সবার কাছে প্রচার করছে–এই যে লেজটা যেভাবে যেভাবে নড়ছে, সবাইকে সেভাবে সেভাবেই নড়তে হবে। কারণ, লেজটা নিরপেক্ষ।

আমেরিকা ও ইউরোপ এই সংস্থাগুলোকে নিজেদের থেকে পৃথক হিসেবে প্রচার করে বলে–সংস্থাগুলো যা করছে, মানুষের কল্যাণের জন্যই সব করছে। সাধারণ মানুষের উচিত সংস্থাগুলোর অনুসরণ করা, সংস্থাগুলোর কথামতো চলা। সংস্থাগুলো যদি কোনো রাষ্ট্রের মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বিবৃতিতে প্রদান করে, তবে আমরা পরাশক্তিরা সংস্থাগুলোর পাশে থেকে উক্ত দেশটিকে শায়েস্তা করব।

ভাবখানা এমন যে, সংস্থাগুলোর সদস্যরা সব নিষ্পাপ ফেরেশতা; তারা এ জগতের কেউ না। মহাজগৎ থেকে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, ক্রাইটেরিয়া অব মোরালিটি, হিউম্যান রাইটস লিজিং সহকারে দেবতা হিসেবে তাদের পাঠানো হয়েছে পৃথিবীতে–কোনো রাষ্ট্র সঠিকভাবে চলল না-চলল, সেই ব্যাপারে বিবৃতি প্রদান করার জন্য; কোনো রাষ্ট্রের কী কী মেনে চলা উচিত, সেই দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য। অথচ বাস্তবতা তো হলো, 'সংস্থা' লেজটিকে নাড়াচ্ছে 'পরাশক্তি' কুকুরটি।

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

মানুষ ভালো খাবে, ভালো পরবে, ভালো ঘরে থাকবে, ভালো বিছানায় ঘুমোবে, ধনী হবে, ভোগবিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ করবে; নিজের স্বার্থকে ঘিরে এসবই তো মানবীয় চাহিদা বা লোভ, যা উপেক্ষা করা বেশ কঠিন। অনেক কিছুকে ঘিরে মানুষের লোভ থাকে। কিছু লোভ বস্তুগত, আর কিছু হলো অবস্তুগত। উল্লিখিত লোভগুলো বস্তুগত। আর ভালোবাসা চাওয়া, সম্মানিত হওয়া, সুনাম অর্জন, প্রশংসিত হওয়া, শ্রদ্ধা পাওয়া ইত্যাদি লোভগুলো অবস্তুগত। তেমনই একটা অবস্তুগত লোভের নাম হলো ক্ষমতা। এমনকি এই লোভটা সব লোভকে ছাপিয়ে যায়।

কারণ, ক্ষমতার স্বাদ অন্য কোনো কিছুতে নেই। তা ছাড়া ক্ষমতা বস্তুগত লোভের সবটা পূরণ করে দেবে। সততা থাকলে অবস্তুগত লোভগুলোও পূরণ করবে। এমনকি সব লোভের সংমিশ্রিত স্বাদের চেয়ে ক্ষমতার স্বাদ বেশি। কেন? স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন মানুষ দলে দলে আমার আনুগত্য করছে, আমাকে ভয় করছে, আমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—এটার যে কী মজা! যে এই স্বাদ পেয়েছে, একমাত্র সে-ই জানবে। কোনো একভাবে এই লোভ পূরণ করার পর তা সহজে কেউ হাতছাড়া করে না। একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে নিচে কেউ নামতে চায় না। অনেক সময় জীবন বাজি রেখে হলেও ক্ষমতায় ধরে রাখতে চায়।

চীনের ক্রমাগত উত্থানের কারণে ছোটো ছোটো অনেক রাষ্ট্র নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চীনের দিকে ঝুঁকছে। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো। কারণ, চীনের হাতে এখন অনেক টাকা। উন্নয়নশীল ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে চীন মোটা অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করছে।

তেল ও গ্যাসসমৃদ্ধ আরব দেশগুলোর সাথেও ধীরে ধীরে চীনের সম্পর্ক উষ্ণ হয়েছে। পারস্পরিক লেনদেন বেড়েছে। একটু খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন, চীন ও আরব দেশগুলোর মাঝে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের লেনদেন হচ্ছে। অথচ আরব দেশগুলোর আগে মাখামাখি ছিল পশ্চিমাদের সাথে। সেই সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই ফাটল ধরেছে। কারণ, পশ্চিমারা ফ্রি স্পিচ, হিউম্যান রাইটস, উইমেন্স রাইটস ইত্যাদি সো কল্ড ইস্যু নিয়ে নিউজ কভারেজ করে ক্রমাগতভাবে

বিশ্বের কাছে আরব দেশগুলোর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে, এখনও করছে। এটা প্রকাশ্যত বেইমানি।

আরব দেশগুলোর প্রধানরা একসময় পশ্চিমাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করত। কিছু আরব রাষ্ট্র এই পশ্চিমাদের মদতে অবৈধ ইজরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছ থেকে অভিশাপ পর্যন্ত কুড়িয়েছে। আমেরিকা আরব আমিরাতকে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের লোভ দেখিয়ে আরব আমিরাতকে দিয়ে ইজরাইলের স্বীকৃতি আদায় করিয়ে খাড়াখাড়ি পলটি নিয়েছে। খাশোগি হত্যা নিয়ে সৌদিকে নাস্তানাবুদ করেছে। এমন ঘটনা আরও অনেক আছে। আরব দেশগুলোর মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী পশ্চিমাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেও জ্বালানি তেল-গ্যাসের লোভে পশ্চিমারা বন্ধুর বেশে আরব দেশগুলোকে খেয়ে ফেলতে চেয়েছে।

তেল উৎপাদনে বিশ্বে সৌদি আরব ৩য়, ইরাক ৫ম, আরব আমিরাত ৭ম, ইরান ৯ম, কুয়েত ১০ম, কাতার ১৫তম, লিবিয়া ১৬তম, ওমান ১৯তম। তেল মজুদে সৌদি আরব ২য়, ইরান ৩য়, ইরাক ৫ম, কুয়েত ৬ষ্ঠ, আরব আমিরাত ৭ম, লিবিয়া ৯ম, কাতার ১৪তম।

পশ্চিমারা সব জায়গায় একটু বেশি সেয়ানা হতে চায় বলেই ধরা খায়। আর এই সেয়ানাগিরির কারণেই পশ্চিমাদের অধঃপতন হচ্ছে। আরব দেশগুলোর মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী অবশ্য প্রধান শত্রুদের এতদিনে চিনতে পেরে সতর্ক হয়েছে। তাই বেশ কয়েক বছর ধরে চীনের দিকে ঝুঁকেছে। এমনকি যেই সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সমগ্র আরব বিশ্ব এক হয়েছিল, এখন আবার সেই রাশিয়ার সাথেই আরব দেশগুলোর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছে।

আফ্রিকার দরিদ্রতম দেশগুলোতে চীন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। বলা চলে আগামীতে আফ্রিকা মহাদেশ হতে যাচ্ছে চীনের কারখানা। কারণ, সস্তা শ্রম লাগবে চীনের। চীন নিজের সস্তা শ্রম দিয়ে সারা বিশ্বে কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে বিশ্ব বাণিজ্যে নিজের একক আধিপত্য বিস্তার করেছে। এখন চীন উন্নত একটা দেশ। চীনা নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। সবার আয় বেড়েছে। ধনী নাগরিকদের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীনের জনসংখ্যা বেশি বিধায় চীনে এখনও সস্তা শ্রম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে সস্তা শ্রম পাওয়া বেশ মুশকিল হবে চীনের জন্য। তখন বিশ্ব বাণিজ্যে নিজের

একক আধিপত্য খোয়াতে হবে। তাই চীন আগেভাগেই আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোকে নিজের জন্য প্রস্তুত করছে। বড়ো অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করে কলকারখানা বানাচ্ছে সেখানে। চীনকে এমন পরিকল্পনার জন্য 'চীনের ওপর বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রেতাত্মা ভর করেছে' বললে একটুও ভুল বলা হবে না। অর্থাৎ, আফ্রিকা মহাদেশে চীনের আধিপত্য যতই বাড়ছে, আমেরিকা ও ইউরোপের প্রভাব সেখানে ততই স্তিমিত হয় আসছে।

তেল উৎপাদনে নাইজেরিয়া ১৪তম, আলজেরিয়া ১৭তম এঙ্গোলা ১৮তম। সোনা উৎপাদনে ঘানা ৬ষ্ঠ, সাউথ আফ্রিকা ১২তম, সুদান ১৩তম, মালি ১৬তম।

ল্যাতিন আমেরিকার কয়েকটা দেশেও চীনের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই দেশগুলোতে ধীরে ধীরে চীনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; যা আগে একচ্ছত্রভাবে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই দেশগুলো আগে আমেরিকার কথায় উঠবস করলেও, এখন তারা আমেরিকাকে ততটা হুজুর হুজুর করে না। ভেনেজুয়েলার ঘটনা তো পেছনেই উল্লেখ করলাম।

তেল উৎপাদনে ব্রাজিল ৮ম, কলম্বিয়া ২১তম, ভেনেজুয়েলা ২৫তম, আর্জেন্টিনা ২৮তম, ইকুয়েডর ২৯তম। তেল মজুতে ভেনেজুয়েলা ১ম।

সোনা উৎপাদনে পেরু ৮ম ও আর্জেন্টিনা ১৭তম। সোনা মজুতে ভেনেজুয়েলা ২৫তম এবং ব্রাজিল ২৮তম। তা ছাড়া ব্রাজিল তো BRICS-এরই সদস্য।

BRICS = Brazil, Russia, India, China, South Africa

এই গ্রুপে আরও যোগ দিতে চাচ্ছে আর্জেন্টিনা ও ইরান। কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে, তেলের রাজ্য সৌদি আরবও যোগ দিতে আগ্রহী।

এই গ্রুপের বর্তমান লক্ষ্য সদস্য দেশগুলো মিলে মার্কিন ডলারকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের মুদ্রায় দ্বিপাক্ষিক আমদানি-রপ্তানি করবে। ইতোমধ্যে রাশিয়া-চীন এবং ভারত-রাশিয়া নিজস্ব মুদ্রায় দ্বিপাক্ষিক লেনদেন শুরু করে দিয়েছে।

ভারত আমেরিকান ব্লকের হওয়া সত্ত্বেও BRICS-এর নীতি বাস্তবায়ন করছে। এটা বেশ মজার একটা টুইস্ট। ভারত এমনটা করতে আসলে বাধ্য হচ্ছে। কারণ,

১. ডলারের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি।

২. নিজের মুদ্রা আন্তর্জাতিক মানে উন্নিত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

মূলত BRICS-এর প্রতিটি সদস্যই এই দুটো কারণেই রেসের ময়দানে নেমেছে। শুধু BRICS না; আমেরিকা বাদে বিশ্বের কমবেশি সবগুলো দেশই মার্কিন ডলারের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। ধনী দেশগুলো অর্থের জোরে চাপ সামাল দিতে পারলেও ২ নং কারণ বাস্তবায়নের স্বপ্ন তারা দেখতেই পারে। নিজের উন্নতি কে না চায়। তবে হাবুডুবু খাচ্ছে মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশগুলো। তাই 'ডলার খেদাও' নীতিতে চীন ও রাশিয়ার সরব প্রতিবাদে অন্য দেশগুলো নীরব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। চীন ও রাশিয়া আমেরিকার পশ্চাদ্‌দেশে আগুনটা জ্বালানোর সাথে সাথে অন্যান্য দেশগুলো চামে দিয়ে বামে এসে চীন ও রাশিয়ার পাশে আগুন পোহাতে বসে গেছে।

সুতরাং চারপাশের পরিস্থিতি দেখে এটুকু অনুমান করা যায় যে, একটু সময় লাগলেও আগামীতে নিশ্চিতভাবে মার্কিন ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্য নিঃশেষ হতে যাচ্ছে। আমার ধারণা, এরপর সম্ভবত একক কোনো মুদ্রার আধিপত্য চলবে না। আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবস্থা চালু হবে। কারণ, বিশ্বনেতারা সবাই মিলে মার্কিন ডলার নামক কুমিরটা খেদিয়ে এর জায়গায় সজ্ঞানে চীনের আরএমবি নামক নতুন কুমিরটা আনবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই ভালো জানেন।

বুড়ো সিংহ আমেরিকার শেষ দাঁতটা হলো ওর ডলার। ডলার শেষ মানে বিশ্বে ওর হম্বিতম্বি শেষ। আমেরিকা শেষ মানে ইউরোপ একটা বাচ্চা বিড়াল। তাই ওরা এত সহজে বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ পশ্চিম থেকে পূর্বে স্থানান্তরিত হতে দেবে না। আর আগামী বিশ্বযুদ্ধ বা মহাযুদ্ধের সূচনাটা হবে এখান থেকেই।

বর্তমানে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনীতির দেশ। অচিরেই নিজেকে প্রথম অবস্থানে নিয়ে যাবে। চীন এককভাবে আগামীতে বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে; যেটা আগে আমেরিকা দিত। এটা আমেরিকা ভালো করেই টের পাচ্ছে। কিন্তু কোটি কোটি মানুষ হত্যা, কোটি কোটি অপকর্ম, কোটি কোটি মানবতাবিরোধী অপরাধ করে কষ্টার্জিত এই ক্ষমতা কি আমেরিকা সহজে হাতছাড়া হতে দেবে? না দেবে না। চীনকে সে

মোকাবিলা করবেই। শেষমেশ কোনো কূলকিনারা না পেলে অলআউট ওয়ারে যাবে। বিষধর সাপ মরার আগে শেষ কামড়টা দেওয়ার চেষ্টা করে। এজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে দরকার চারপাশ থেকে চীনকে ঘিরে ফেলা। এজন্য দরকার চীনের আশেপাশের দেশে মিলিটারি বেইজ তৈরি করা। আর আমেরিকা সে পরিকল্পনা নিয়েই সামনে এগোচ্ছে।

★ চীনের দক্ষিণ দিকের দেশ সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইনে আমেরিকার মিলিটারি বেইজ আছে। চীনকে মোকাবিলায় এটা যথেষ্ট নয়। কারণ, এই দুটো দেশ ও চীনের মাঝে আছে বিশাল দক্ষিণ চীন সাগর। এতদূর থেকে চীনকে হুমকি-ধমকি দেওয়া তেমন একটা ফলপ্রসূ হবে না।

★ চীনের পূর্ব দিকের দেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়ও আমেরিকার মিলিটারি বেইজ আছে। কিন্তু থাকলে কী হবে, পাশেই চীনের ঘনিষ্ঠ দুই মিত্র দেশ উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়া। এই দুটো দেশই আমেরিকার প্রধানতম শত্রু এবং পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী। তাই চীনের সাথে যুদ্ধ লাগলে এই পাশ থেকে আমেরিকা খুব বেশি একটা সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না।

★ ভারত আমেরিকান ব্লকের। কিন্তু ভারত আমেরিকান সেনাবাহিনীকে নিজ দেশে প্রবেশ করাবে না। মূল কারণটা হয়তো আন্দাজ করতে পারছেন। আন্দাজ না করতে পারলে একটু পরে বলছি। ভারত চাচ্ছে চীন ও পাকিস্তানের সাথে ক্যাঁচালটা বাড়ির বাইরে থেকে সেরে ফেলতে। অন্য ভাষায় বললে—ধরি মাছ না ছুঁই পানি। তা ছাড়া ভারতের মাটিতে যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি হলে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো বিশাল একটা সুযোগ পেয়ে যাবে।

★ পাকিস্তানও নিজ দেশে আমেরিকান সেনাবাহিনীকে পুনরায় প্রবেশ করাবে না। মার্কিন ডলারের লোভে ওয়ার অন টেরর-২০০১ প্রজেক্টের শিক্ষা পাকিস্তান হাড়েহাড়ে পেয়েছে। পাকিস্তানের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষাটা ছিল—আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভারত আফগানিস্তানে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছিল। ফলে ভারত নিজের মাটি থেকে পাকিস্তানকে ট্যাকল করার পাশাপাশি আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে পাকিস্তানের ভেতরে অবাধে গোয়েন্দা তৎপরতা চালাত, পাকিস্তানে স্যাবোট্যাজ করত, পাকিস্তানের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ করত। অর্থাৎ, পূর্ব ও পশ্চিম দু-দিকের সীমান্ত থেকেই ভারত পাকিস্তানকে ওই

২০টা বছর চাপে রেখেছিল। এটা ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যর্থতা। আর প্রথম ব্যর্থতা ছিল '৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া করা। অর্থাৎ, ভারত নিজের পূর্ব পাশ পাকিস্তানের বলয় থেকে মুক্ত করে উলটো পাকিস্তানকেই দু-পাশ থেকে চেপে ধরল। এটা ভারতের সফলতা। তাই পাকিস্তান ভুলেও আর এই ফাঁদে পা দেবে না।

★ সেন্ট্রাল এশিয়ার এক্স-সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলো এখনও রাশিয়ান বলয়ে আছে। নতুন করে চীনও এসব দেশে প্রভাব বিস্তার করেছে। রাশিয়া ও চীনকে পাশ কাটিয়ে এই রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার সাথে সহবাস করতে গেলে এদেরও ইউক্রেনের মতো পরিস্থিতি হবে।

★ মিয়ানমারের অধিকাংশ এলাকা পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় এসব এলাকায় হেভি আর্মামেন্ট, হেভি মিলিটারি ইকুইপমেন্ট, হেভি অ্যার্টিলারি, ট্যাংক ইত্যাদি বহন করা সহজ হবে না। তা ছাড়া নিরবচ্ছিন্নভাবে রসদ সরবরাহ করতে না পারলে যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত। আফগানিস্তানের পাহাড়ে পাহাড়ে যুদ্ধ করার বিভীষিকাময় স্মৃতি আমেরিকার মনে আছে।

★ তাই আমেরিকার জন্য বাংলাদেশ হলো সবচেয়ে সুইটেবল এরিয়া। বাংলাদেশ একেবারে চীনের কোলে। এই দুই দেশের সীমান্ত বরাবর সরলরৈখিক দূরত্ব খুব কম।

–// কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের সাথেই বিমানবন্দর আছে; যা হতে পারে আমেরিকার এয়ার বেইজ। এয়ার বেইজে থাকবে এফ-১৬, এফ-২২, এফ-৩৫-এর মতো ৫ম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান ও কম্ব্যাট ড্রোন। আমেরিকা এই এয়ার বেইজ থেকে ফুস করে উড়াল দিয়ে টুস করে চীনে বোমা মেরে ফিরে আসতে পারবে। যুদ্ধবিমান ওড়ানোর খরচও কম হবে। এসব যুদ্ধবিমান এক ঘণ্টা ওড়াতে ২০-৩০ লাখ টাকা খরচ হয়।

–// সেন্টমার্টিন দ্বীপ হতে পারে আমেরিকার নেভাল বেইজ। এখানে থাকবে ফ্রিগেট, কর্ভেট, ডেস্ট্রয়ার, ল্যান্ডিং শীপ, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, নিউক্লিয়ার

সাবমেরিনের মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ। যা দিয়ে আমেরিকা 'মেরিটাইম সিল্ক রোড' নামে চীনের বাণিজ্যিক সমুদ্রপথটা আঙুলের ইশারায় নিয়ন্ত্রণ করবে।

—// উত্তরবঙ্গের দিকে হতে পারে আমেরিকার আর্মি বেইজ। এখানে থাকবে হেভি আর্টিলারি, লং ও শর্ট রেইঞ্জ ক্রুজ মিসাইল, লং ও শর্ট রেইঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল, অ্যান্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল, হাইপারসনিক মিসাইল, এমনকি নিউক্লিয়ার ওয়ার হেড মিসাইল। আমেরিকা এগুলো চীনের দিকে তাক করে রাখবে।

ভৌগোলিক সুবিধা ছাড়াও আরেকটা কারণে বাংলাদেশ আমেরিকার সুইটেবল ব্যাটল গ্রাউন্ড। এই কারণটা একেবারে শেষে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

তো, চীনের মতো একটা উন্নত দেশের কাছে যত আধুনিক সমরাস্ত্রই থাকুক না কেন, ঘরের পাশে আমেরিকার মতো প্রধান শত্রু নিয়ে চীন নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে না; পারার কথাও না। কোনো দেশই পারবে না; এমনকি আমেরিকাও না। চীন সার্বক্ষণিক হুমকিতে থাকবে। ফলে যেই ব্যবসা চীনকে আজ উন্নতির শিখরে এনেছে, চীনের সেই ব্যবসা একসময় আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। আমেরিকা উঠতে বললে চীন উঠবে, বসতে বললে চীন বসবে, শুতে বললে চীন শোবে।

রাশিয়া যেমন নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইউক্রেনে হামলা করেছে, একসময় চীনও নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে বাংলাদেশকে ঘিরে একই পদক্ষেপ নিতে গেলে আমেরিকা জবাব দেবে। রাশিয়ার বেলায় আমেরিকা বসে থাকলেও চীনের বেলায় বসে থাকবে না; বরং পশ্চিমা এলাইদেরকে নিয়ে চীনে আক্রমণ করবে। প্রথম কারণ হলো, আমেরিকা চাচ্ছেই চীনের সাথে যুদ্ধ বাধাতে। দ্বিতীয় কারণ হলো, আমেরিকা যদি চীনকে দমিয়ে দিতে পারে, তাহলে রাশিয়াও ঠান্ডা হয়ে যাবে।

আমেরিকা আগ বাড়িয়ে চীনে হামলা করলে চীনও পালটা হামলা করবে। এসবই হবে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে। আমেরিকা নিজের ভূখণ্ডে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, করে না (সিরিয়াতে 'আমেরিকা বনাম রাশিয়া' প্রক্সি ওয়ার হয়েছে)। আমেরিকা শত্রুর ভূখণ্ডে হামলা করবে; তবে সেটা অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ব্যবহার করে করবে। যদিও অলআউট ওয়ারে আমেরিকা নিজেও আক্রান্ত হবে। কিন্তু সেটা হবে

একেবারে শেষের দিকে। যাকে বলে মরণযুদ্ধ। নিউক্লিয়ার ওয়ার। পৃথিবী মৃত্যুপুরীতে পরিণত হবে। যদি প্রাথমিক পর্যায়েই চীনকে ধরাশায়ী করা যায়, তাহলে আমেরিকা সাপও মারল, লাঠিও ভাঙল না।

এজন্যই ভারত আমেরিকার সাথে অবৈধভাবে সহবাস করবে; কিন্তু আমেরিকার কাছে বিয়ে বসবে না। মানে ভারতের মাটিতে আমেরিকান মিলিটারি বেইজ বানাতে দেবে না। অন্যথায় চীন ভারতকে তছনছ করে দেবে। চীন বনাম ভারত ঐতিহাসিক বিরোধ তো আছেই। ভারতকে এক তুড়িতে শায়েস্তা করার ক্ষমতা চীনের আছে। ভারত টুঁ শব্দটি করতে পারবে না। কারণ, ভারত তার সমরাস্ত্রের প্রায় ৯০% অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করে। আর চীন নিজের সমরাস্ত্র নিজেই তৈরি করে। (চীন কিছু এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম রাশিয়া থেকে আমদানি করে। যেমন : S-৪০০)। চীন সামরিক দিক থেকে এখন আমেরিকাকে মোকাবিলা করার সক্ষমতা রাখে।

যুদ্ধে বিজয় লাভ অনেকটা নির্ভর করে নিরবচ্ছিন্নভাবে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার ওপর। অন্যথায় পরাজয় নিশ্চিত। অস্ত্র আমদানি করাটা দীর্ঘ একটা প্রক্রিয়া। সময় লাগে। মিত্র দেশগুলো যদি দ্রুত সহযোগিতা পাঠায়ও, তবুও লম্বা একটা সময় অপেক্ষায় থাকতে হবে। যুদ্ধকালীন সময় অস্ত্র আমাদানি করে খুব বেশি সময় যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকা যায় না। সম্প্রতি চীনের কাছে লাদাখে প্যাঁদানি খাওয়ার পর পর ভারত খুব চড়া দামে ফ্রান্স থেকে ৩৬টা রাফেইল ফাইটার জেট ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এর মধ্যে কয়েকটা ফাইটের জেট ছিল সেকেন্ড হ্যান্ড। কারণ, সমরাস্ত্র আমদানি করতে হলে আগে অর্ডার করতে হয়, এরপর ডেলিভারি পাওয়া যায়।

মজার একটা বিষয় হলো, ভারতের ৬৫-৭০% সমরাস্ত্র রাশিয়া থেকে আমদানি করা। যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, ট্যাংক, অ্যার্টিলারি, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ইত্যাদি সবকিছুই। এগুলো কিনলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। এগুলোর সাথে মিসাইল, রকেট, টর্পেডো, অ্যামুনিশন কিনতে হয়, মেইনটেইনেন্স করতে হয়, স্পেয়ার পার্টস কিনতে হয়। এগুলো ছাড়া সমরাস্ত্র একপ্রকার অচল মাল। গুলি ছাড়া বন্দুক যেমন একটা খেলনা। মিসাইল, রকেট, টর্পেডো, অ্যামুনিশন ছাড়া ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন তেমনই মুড়ির টিন।

চীন বানম ভারত যুদ্ধ লাগলে চীনের প্রধান মিত্র রাশিয়া ভারতকে ওসব যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিরবচ্ছিন্নভাবে কতটুকু সরবরাহ করে যাবে বা করতে পারবে, সেটা আসলে ভাবার বিষয়। কারণ, চীনের সাথে যুদ্ধ করা মানে হলো ভারত আমেরিকান ব্লকের হয়ে যুদ্ধ করছে। আমেরিকা হলো রাশিয়ার প্রধান শত্রু, চীন হলো রাশিয়ার প্রধান মিত্র। প্রধান মিত্রের বিপক্ষে প্রধান শত্রুর পক্ষ হয়ে লড়াই করা কাস্টমারকে রাশিয়া যুদ্ধ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করবে না।

অনেকে বলে, বাংলাদেশ চীন-রাশিয়া এবং আমেরিকা-ইউরোপ উভয় ব্লকেই পা দিয়েছে। দুই নৌকায় পা দিলে মাঝখান থেকে চ্যাগায় যাবে একদিন। কথা সত্য। কিন্তু দুই নৌকায় ভারতও পা দিয়েছে। কীভাবে? একটু আগেই বলেছি–ভারতের ৬৫-৭০% সমরাস্ত্র রাশিয়া থেকে আমদানি করা। ভারতের মতো বিশাল একটা দেশের মিলিটারি পাওয়ার আপগ্রেড করতে হলে আধুনিক সমরাস্ত্র দরকার। আমেরিকা ভারতকে সেসব সমরাস্ত্র দেবে না। ভারত বিকল্প হিসেবে সেসব সমরাস্ত্র পেয়েছে রাশিয়ার থেকে। যেমন : আমেরিকান এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম 'Thaad'-এর বদলে রাশিয়ান S-৪০০, আমেরিকান F-২২-এর বদলে রাশিয়ান Su-৩০ ইত্যাদি। সোভিয়েত আমল থেকেই ভারত রাশিয়া থেকে সমরাস্ত্র পেয়ে আসছে। সেই রাশিয়াকেই যদি ভারত ক্ষেপিয়ে তোলে, তবে এর ফলাফল দাঁড়াবে–ভারতের ৬৫-৭০% সমরাস্ত্র মুড়ির টিন হিসেবে হাটে বেচে দিতে হবে। এজন্যই কিন্তু ইউক্রেন প্রসঙ্গে ভারত জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি। একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে চীনের ভয়ে আমেরিকান ব্লকে যাওয়া। ভারত কিন্তু সেই রকম একটা গ্যাঁড়াকলে আছে। ভারতের এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা।

নতুন জাদুকর

চীনের **'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড'** প্রকল্পটা নিয়ে জানা এজন্য জরুরি যে, বিশ্বের কোনো দেশে ঝামেলা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে কে বা কারা কলকাঠি নাড়ছে এবং কোন দেশ কোন ব্লকের হয়ে কাজ করছে, সেই ব্যাপারটা সহজেই আঁচ করতে পারা যাবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতির যত দোলাচল, যত অস্থিতিশীলতা– সব এই প্রকল্পকে ঘিরেই। আগামী বিশ্বরাজনীতির রূপরেখা তৈরি করবে এই প্রকল্প।

(পরবর্তী অংশটুকু পড়ার আগে বিশ্ব মানচিত্রটাতে ভালোভাবে একটু চোখ বুলিয়ে নিলে বুঝতে সহজ হবে। অথবা হাতের সামনে বিশ্বের একটা মানচিত্র নিয়ে এই অংশটুকু পড়তে থাকুন।)

'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' প্রকল্পের আওতাধীন স্থলপথ ও **'মেরিটাইম সিল্ক রোড'** প্রকল্পের আওতাধীন সমুদ্রপথ। এই দুটো প্রকল্পকে একসাথে বলা হয় **'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড'**। চীন তার ব্যবসা সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে বিগত ২০১৩ সালে 'The Silk Economic Belt And The 21st Century Maritime Silk Road Development Strategy' নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের অধীনে ল্যাতিন আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, পশ্চিম-এশিয়া, মধ্য-এশিয়া, পূর্ব-এশিয়া এবং দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলোকে স্থলপথ ও সমুদ্রপথের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে।

চীন বলছে–আজ থেকে ২২০০ বছর আগে চীন, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের মধ্যে Silk Road নামে একটি বাণিজ্যপথ ছিল। যেটাকে তারা এখন Ancient Silk Road নাম দিয়েছে। এটাকেই চীন এখন আরও বিস্তৃতভাবে তৈরি করতে যাচ্ছে। কাজ অনেক দূর এগিয়েও গেছে।

এই পর্যন্ত ১৪৭টি দেশ এই প্রকল্পের আওতায় আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোর জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৬৫% এবং পৃথিবীর মোট জ্বালানি রিজার্ভের ৭৫% এই দেশগুলোর কাছে আছে।

-// দেশগুলো হলো–

★ পূর্ব-এশিয়া ও প্যাসিফিকের ২৫টি দেশ :

চীন, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই, দক্ষিণ কোরিয়া, মালেশিয়া, মঙ্গলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি।

★ দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশ :

আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও নেপাল।

★ পশ্চিম-এশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার নয়টি দেশ :

তুরস্ক, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান।

★ মধ্যপ্রাচ্য ১১টি দেশ :

সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, ইয়েমেন, বাহরাইন, ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও লেবানন।

★ ইউরোপের ২৬টি দেশ :

অস্ট্রিয়া, বেলারুশ, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, চেক রিপাবলিক, সাইপ্রাস, এসটোনিয়া, গ্রিস, হাঙ্গেরি, ইতালি, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, সার্বিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া ইত্যাদি।

(বেলারুশ বাদে উল্লিখিত সবগুলো দেশই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র।)

★ উত্তর আফ্রিকার ছয়টি দেশ :

মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, জিবুতি, মরক্কো ও তিউনিসিয়া।

★ সাব-সাহারান আফ্রিকার ৪৩টি দেশ :

ইথিওপিয়া, ঘানা, কেনিয়া, মালি, নাইজার, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, সিয়েরালিওন, সোমালিয়া, সুদান, সাউথ সুদান, তানজানিয়া, জিম্বাবুয়ে ইত্যাদি।

★ ল্যাতিন আমেরিকান নয়টি দেশ :

আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, চিলি, ইকুয়েডর, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা ইত্যাদি।

★ ক্যারিবিয়ান ১১টি দেশ :

কোস্টারিকা, কিউবা, জ্যামাইকা, পানামা ইত্যাদি।

স্থলপথের প্রকল্পের নাম Belt Road Initiative (BRI) :

স্থলপথে মূল ছয়টি করিডোর হবে। করিডোরগুলোর আরও শাখা-প্রশাখা থাকবে। এই প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোতে হাইওয়ে, রেইলওয়ে, টানেল, রেইলরোড টানেল, স্থলবন্দর, বিমানবন্দর, ব্রিজ, শিল্প এলাকা, কয়লাচালিত-হাইড্রো-সোলার-উইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করার পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে। ফলে দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ হবে। পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে সময় কম লাগবে।

-// করিডোরগুলো হলো–

(১) The New Eurasian Land Bridge :

চীন -> কাজাকিস্তান -> রাশিয়া -> বেলারুস -> পোল্যান্ড -> জার্মানি

(২) The China - Central Asia - West Asia Corridor :

চীন -> কাজাকিস্তান -> কিরগিজিস্তান -> উজবেকিস্তান -> তাজিকিস্তান -> তুর্কমেনিস্তান -> ইরান -> তুরস্ক

(৩) The China - Indochina Peninsula Economic Corridor :

চীন -> ভিয়েতনাম -> লাওস -> থাইল্যান্ড -> কম্বোডিয়া

(৪) The China - Mongolia - Russia Corridor :

চীন -> মঙ্গলীয়া -> রাশিয়া

(৫) The China - Myanmar - Bangladesh Corridor :

চীন -> মিয়ানমার -> বাংলাদেশ

(৬) The China - Pakistan Economic Corridor :

চীন -> পাকিস্তান

সমুদ্রপথের প্রকল্পের নাম Maritime Silk Road :

জলপথে মূল নয়টি গভীর সমুদ্রবন্দর হবে। এ ছাড়াও আরও ছোটো ছোটো বন্দর থাকবে। যা দিয়ে চীন থেকে ইউরোপ পর্যন্ত একটি বাণিজ্যিক রুট তৈরি হবে। এই নয়টি বন্দরের সমন্বিত রুটের নাম দেওয়া হয়েছে **'String of Pearls'**।

নয়টি বন্দর যেই দেশগুলোতে তৈরি হবে এবং হয়েছে :

চীন -> কম্বোডিয়া -> মিয়ানমার -> বাংলাদেশ -> শ্রীলংকা -> মালদ্বীপ -> পাকিস্তান -> জিবুতি (আফ্রিকা) -> সুদান।

এই সমুদ্রপথটা চীনের হংকং থেকে দক্ষিণ চীনসাগর হয়ে মালাক্কা প্রণালি দিয়ে বের হয়ে বঙ্গোপসাগর দিয়ে শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ অতিক্রম করবে। এরপর আরবসাগর দিয়ে লোহিত সাগর হয়ে সুয়েজ ক্যানেলের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছে ইস্তাম্বুল ও এথেন্স অতিক্রম করে ইতালির ত্রিয়েস্তি বন্দরে পৌঁছবে। এরপর টিরেনিয়ান সাগর হয়ে অ্যালবোরান সাগর দিয়ে জিব্রাল্টার প্রণালির মধ্য দিয়ে বের হয়ে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে ক্যারিবিয়ান অঞ্চল এবং লাতিন আমেরিকা পর্যন্ত যাবে।

এই দেশগুলো ছাড়াও আরও কিছু দেশ আছে, যারা অনানুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে। চীন এসব দেশেও বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। দেশগুলো হলো : বেলজিয়াম, জার্মানি।

তা ছাড়া ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের নীতিনির্ধারকদের কথাবার্তায় এই প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হওয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পালের গোদা আমেরিকাকে পাশ কাটিয়ে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের পক্ষে এই কাজটা একটু কঠিন হবে। কারণ, আমেরিকার সবচেয়ে কাছের ক্রাইম পার্টনার এই দুটো দেশ। তবে আজ অথবা কাল এই দেশ দুটিও চীনের প্রকল্পে অংশগ্রহণ করবে; একটু পর প্রমাণ দিচ্ছি।

সবচেয়ে মজার একটা কথা কি জানেন। এই প্রকল্পে ইজরাইলও আছে। জি, ঠিকই শুনেছেন। ইজরাইল। আমেরিকার 'প্রধান' মিত্র। এই ইজরাইলের জন্য আমেরিকা কী না করেছে। ফিলিস্তিনদে পাইকারিভাবে হত্যার বৈধতা দিয়ে রেখেছে ইজরাইলকে। অর্থ, অস্ত্র, নিউক্লিয়ার বোমা সরবরাহ করে যাচ্ছে।

আপনারা খেয়াল করেছেন কি না জানি না। ইজরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ২০১৭ সালে পাঁচশত সদস্যের বিশাল দল নিয়ে চীন সফরে গিয়েছিল। এরপর ২০১৮ সালে ইজরাইলের একটা বন্দর ২৫ বছরের জন্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয় চীনকে। এরও বেশ কয়েক বছর আগে ২০১৩ সালে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইজরাইল সফর করে গিয়েছে। চীন এই প্রকল্পের অধীনে ইজরাইলে এই পর্যন্ত সাত বিলিয়ন ডলারের অধিক বিনিয়োগ করেছে।

চীন-ইজরাইল কূটনৈতিক সম্পর্কের শুরুটা ১৯৯২ সালে হলেও, তারও আগে থেকে এই দুই দেশের মধ্যে তলে তলে ট্যাম্পু চলত। ক্রমাগত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকা তৎকালীন চীনের দরকার ছিল সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন। আর ইজরাইলের দরকার ছিল টাকা। চীনের কাছে টাকা থাকলেও সামরিক বাহিনীকে আধুনিকায়নের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মেধা চীনের নেই। চীন শুধু হুবুহু নকল করতে পারদর্শী। তাই সে রকেট, স্যাটেলাইট, রোবোটিকস এবং সামরিক প্রযুক্তির জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। আজকে চীনের কাছে এত অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, সাবমেরিন, ট্যাংক, মিসাইল, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ইত্যাদি থাকার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাশিয়ার,

এরপর ইজরাইলের। বর্তমানে রাশিয়ার পর ইজরাইল হলো চীনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সামরিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সরবরাহকারী।

আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার দাবি হলো, ইজরাইল আমেরিকা ও ইউরোপের কাছ থেকে অত্যাধুনিক যেসব সামরিক প্রযুক্তি পায়, সেগুলো গোপনে চীনের কাছে বিক্রি করে দেয়। আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা আরও দাবি করে যে, ইজরাইল চীন থেকে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য আশির দশকেই চীনের কাছে মিসাইল, লেজার, যুদ্ধবিমান ও ট্যাংক আধুনিকায়নের প্রযুক্তি বিক্রি করেছে। ইজরাইলের বিরুদ্ধে আমেরিকার এমন অভিযোগও আছে যে, আমেরিকার টপ সিক্রেট প্যাট্রিয়ট মিসাইলের প্রযুক্তি ইজরাইল চীনের কাছে বিক্রি করেছে। আমেরিকা ও ইউরোপ নিজেদের সামরিক প্রযুক্তি চীনের হাতে পৌঁছানোর সকল পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে। আর ইজরাইল এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাকডোর দিয়ে গোপনে এসব সামরিক প্রযুক্তি চীনের কাছে চড়া দামে বিক্রি করে দিচ্ছে। বিনিময়ে চীন নতুন নতুন সামরিক সরঞ্জাম তৈরির জন্য ইজরাইলের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করছে। জানেনই তো, যেকোনো নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গবেষণা ব্যয় অনেক।

২০০০ সালের পর থেকে চীন-ইজরাইল সম্পর্ক অনেকটা প্রকাশ্যভাবে চলে। ২০০৭ সালে প্রথমবারের মতো ইজরাইলের কোনো প্রধানমন্ত্রী চীন সফরে যায়। যেখানে ১৯৯২ সালে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য হয়েছে মাত্র ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের। ২০১০ সালে সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এর মধ্যে ১৯৯৯-২০১১ সালের এই সময়টাজুড়ে চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, নৌবাহিনী-প্রধান, চিফ অব আর্মি স্টাফ আলাদা আলাদাভাবে ইজরাইল সফর করে। ২০১৭ সালে চীন সফরের আগেও একবার নেতানিয়াহু ২০১২ সালে চীন সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু আমেরিকার চাপে তা বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছিল তখন।

স্বামী আমেরিকাকে না জানিয়ে এই বারোভাতারি স্ত্রী ইজরাইল চীনের সাথে পার্কের ঝোপঝাড়ে গিয়ে এমন অনেক কিছুই করতে চেয়েছিল, যা একসময় আমেরিকার চাপে বাদ দিতে হয়েছে। (বারোভাতারি বললাম কারণ—এককালে ব্রিটেনের সাথে শুয়েছে, এরপর আমেরিকা। এখন চীনের সাথে শোয়। মাঝে মাঝে রাশিয়াকেও ঘাটে নৌকা ভিড়াতে দেয়।) কিন্তু আমেরিকা এই তলে তলে ট্যাম্পু

চলা পুরোপুরি বন্ধ করতে পারেনি। কীভাবে পারবে বলুন? বারোভাতারি ইজরাইলের যৌবনজ্বালা অনেক। বুড়ো জামাই যদি 'দিতে' না পারে, তাহলে টগবগে তরুণ নাগর চীনের কাছে ইজরাইল ছুটে যাবেই। (মানে–টাকা দিতে পারার কথা বললাম আরকি!)

ইজরাইল গর্ভবতী হতে চায়। ওকে একটা এক চোখা দাজ্জাল বা অ্যান্টি ক্রাইস্ট বা ফেইক মাসায়া জন্ম দিতে হবে যে। ওই দাজ্জাল এক বছর এক মাস এক সপ্তাহ এক দিন আঙুলের ইশারায় বিশ্ব শাসন করবে। এজন্য ওর দরকার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা, অর্থসম্পদ, আধুনিক প্রযুক্তি, আধুনিক সমরাস্ত্র, বিশ্ব অর্থনীতি, খাদ্য ও পানীয়-জলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। ইজরাইলকে সেসবের বন্দোবস্ত করতে হবে। তবেই কানা বাচ্চাটা বের হয়ে আসবে। এর আগে না। তাই ওসব ক্ষমতা ইজরাইলকে যে এনে দেবে, ইজরাইল তার কাছে নিজেকে সঁপে দেবে। বিনিময়ে উক্ত দেশটি ইজরাইলের নিকট থেকে পাবে নিকট ভবিষ্যৎ সময়ের কিছু নিশ্চিত তথ্য, দিকনির্দেশনা, পরিকল্পনা। যা দিয়ে উক্ত দেশটি অন্য দেশগুলোকে পেছনে ফেলে তরতরিয়ে উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাবে। এজন্যই দেখবেন, আমেরিকা ও ইউরোপ ইজরাইলকে নম নম করে চলে। যারা আমার 'নম নম' দাবির সাথে দ্বিমত করতে চাচ্ছেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করি–শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শ্যাওলার মতো একূল থেকে ওকূলে ভেসে চলা ইহুদি জাতিকে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক হঠাৎ এমন নম নম করতে দেখে কি একটু সন্দেহ জাগে না ভেতরে? আরে ভাই, চলমান ঘটনাগুলোর যেই হিসাব আপনারা মেলান, তা অন্তত লজিক্যাল হতে হবে তো নাকি? দ্বিমত পোষণকারীদের কাছে আছে কোনো ভিন্ন লজিক্যাল ব্যাখ্যা এই 'নম নম' করার ব্যাপারে?

হিসাবে পশ্চিমারা যদি আমেরিকার যৌনদাসী হয়, তাহলে ইজরাইল হলো আমেরিকার বউ। সে বউ আজ পরকীয়ায় লিপ্ত। বউয়েরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বাকিদের কী অবস্থা। বউকে ঘরে ফেরাতে আমেরিকা ২০১৮ সালে ওর দূতাবাস তেল আবিব থেকে জেরুজালেমে নিয়ে আসে; যা প্রত্যক্ষভাবে ইজরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনের স্বাধীন ভূখণ্ড দখলের সমর্থন এবং আন্তর্জাতিক আইনপরিপন্থি। তাতেও খুব বেশি একটা লাভ হয়নি। এরপর বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। ইজরাইলের পার্লামেন্ট ভেঙে

যায়। নতুন প্রধানমন্ত্রী আসে। এক সাক্ষাৎকারে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বাইডেনের অঙ্গভঙ্গি নিয়ে ব্যঙ্গ করে।

অর্থাৎ, তালাক শুধু ভারত-আওয়ামী লীগই হয়নি (এটা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা আসবে), আমেরিকা-ইজরাইলেরও তালাক হয়েছে। আমার কথায় অবাক হতে পারেন। সময় হোক, সবই প্রকাশিত হবে। একটা কথা শুনে রাখুন, ইহুদিরা হলো চরম বিশ্বাসঘাতক ও স্বার্থপর। ধূর্ত ও চতুরও বটে। ওরা ভীষণ উগ্রজাতিবাদী। ওরা ইহুদি জাতির কল্যাণে একবিন্দুও ছাড় দেয় না। নেতানিয়াহু বাইডেনকে কেন ব্যঙ্গ করেছিল জানেন? ইজরাইলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফটালি বেনেটের সাথে হোয়াইট হাউসে সাক্ষাতের সময় বাইডেন মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ রেখেছিল কিছুক্ষণ। বাইডেন নাকি ঘুমিয়েছে সে সময়। পাশে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বসিয়ে রেখে চোখ বন্ধ করে বসে থাকাটা আসলে একপ্রকারের অপমান। অতিথিকে গুরুতহীন মনে হয় তখন। আসলে বাইডেন এটা ইচ্ছে করেই করেছে। কারণটা পরে বলছি। এই সেই নাফটালি, যে কি না নেতানিয়াহুকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল। একটু ভেবে দেখুন, এরা কতটা উগ্রজাতিবাদী। নাফটালি প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও নেতানিয়াহু নাফটালির অপমানে বাইডেনকে ব্যঙ্গ করেছে। কারণ, ওদের কাছে ক্ষমতার চেয়ে ইহুদি জাতির স্বার্থ আগে।

এবার অপমানের কারণটা বলি। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময় ২০১৯ সালে একটা খবর বের হয়েছিল যে, ইজরাইল আমেরিকার হোয়াইট হাউসের আশেপাশে মোবাইল ফোন স্পাইয়িং ডিভাইস স্থাপন করেছে। অসম্ভব কিছু না। হোয়াইট হাউসে ইহুদিদের অবাধ প্রবেশাধিকার আছে। তা ছাড়া আমেরিকার সামরিক বাহিনীর গোপন তথ্য ইজরাইলে পাচার করার অভিযোগে Jonathan Pollard নামে আমেরিকান নেভিতে চাকরিরত এক ইহুদিকে ১৯৮৭ সালে ৩০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। যাহোক, পুনরায় একই ঘটনা ঘটার পর সে সময় ট্রাম্পের ভাষ্য ছিল–সে বিশ্বাস করে না যে ইজরাইল এমনটা করতে পারে, তবে এটা সম্ভব হতেও পারে। আসলে ইহুদিদের দরকার টাকা আর আশ্রয়-প্রশ্রয়। ওরা ভালোভাবে বুঝে গেছে যে, আমেরিকার বেলা ফুরিয়ে এসেছে। আগামীর ক্ষমতাসীন হবে চীন। তাই আগেভাগেই ডিগবাজির প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ধীরে ধীরে পাল্লা কোন দিকে ভারী হচ্ছে, আর কে হতে যাচ্ছে আগামী বিশ্বের মোড়ল।

ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড; এই পুরো প্রকল্প বাস্তবায়নের মোট আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৪-৮ ট্রিলিয়ন বা ৪-৮ লাখ কোটি ডলার। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের কিছু অংশ সরবরাহ করবে ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), যেখানে চীনের প্রভাব বেশি বা মূলত চীনই এটি পরিচালনা করে। যেমনটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে আমেরিকার প্রভাব বেশি বা মূলত আমেরিকাই তা পরিচালনা করে। তাই এই ব্যাংকটিকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে। আমেরিকা AIIB-এর ওপর বেজায় নাখোশ হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার সবচেয়ে কাছের মিত্র কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারত, তুরস্ক, সৌদি, দুবাইসহ ইউরোপ-মধ্যপ্রাচ্য-এশিয়ার ধনী ধনী দেশগুলো এই ব্যাংকের সদস্য হয়েছে। ব্যাংকে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করছে। সদস্য সংখ্যা এখন পর্যন্ত ১০৭। বিভিন্ন দেশকে এই ব্যাংক খুব সহজ শর্তে, বিশেষ করে মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে বিনা শর্তে ঋণ দিতে চাইছে এবং অনেক দেশকে দিয়েছে। ফলে এই তিন মহাদেশের দেশগুলো এই প্রকল্পে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহী হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে এক পাকিস্তানেই চীন বিনিয়োগ করেছে ৬২ বিলিয়ন বা ৬২০০ কোটি ডলার। চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের কাশগর থেকে পাকিস্তানের আজাদ-কাশ্মীর প্রদেশের ভেতর দিয়ে স্থলপথ (G৩১৪) তৈরি করা হয়েছে। এই স্থলপথ (G৩১৪) Belt Road Initiative প্রকল্পের আওতাধীন। এই স্থলপথ (G৩১৪) আবার পাকিস্তানের গোয়াদার সমুদ্রবন্দরে এসে মিলবে। গোয়াদারে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণকাজও চলমান। গোয়াদার গভীর সমুদ্রবন্দর আবার Maritime Silk Road প্রকল্পের আওতাধীন। চীনের কাশগর থেকে যেই স্থলপথটা (G৩১৪) পাকিস্তানের আজাদ-কাশ্মীর সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। পাকিস্তান অংশে এই স্থলপথটাকে (G৩১৪) বলা হয় কারাকোরাম হাইওয়ে। এর উত্তর-পশ্চিমে আছে আফগানিস্তান। সীমান্তঘেঁষে দক্ষিণ-পূর্বে ভারতের দখলকৃত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ। ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে নেপাল। পাকিস্তান, ভারত, নেপাল—এই তিনটি দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে হলো চীন। চীন ও এই তিন দেশের মাঝে আছে বিশাল হিমালয় রেঞ্জ ও কারাকোরাম রেঞ্জ। মাউন্ট এভারেস্ট, কে২, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণাসহ পৃথিবীর ১৪টি এইট থাউসেন্ডার্স (৮ হাজার মিটার উচ্চতার পর্বত) পর্বত এবং পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু উঁচু পর্বতগুলো এই অঞ্চলগুলোতেই অবস্থিত। সারা বছর শুভ্র বরফে আচ্ছাদিত থাকে। ভয়াবহ

রকমের দুর্গম অঞ্চল এগুলো। দুর্গম শব্দটাও আসলে এসব অঞ্চলের জন্য বেমানান।

লাদাখের ঠিক উত্তর-পশ্চিমে ভারত ও চীনের অমীমাংসিত অঞ্চল আকসাই চিন। আকসাই চিনকে ভারত নিজেদের দাবি করে; কিন্তু দখলে আছে চীনের। আকসাই চিন অঞ্চলের ভেতর দিয়েই চীন Belt Road Initiative প্রকল্পের একটি রাস্তা (G২১৯) তৈরি করেছে। রাস্তাটা (G২১৯) চীনের তিব্বতের লাশা থেকে নেপাল ও ভারতের উত্তরাখাণ্ড-হিমাচল-লাদাখ প্রদেশের সীমানার কাছ দিয়ে একসময় জিনজিয়াংয়ের কাশগড় গিয়ে মিলিত হয়েছে।

আপনাদের হয়তো মনে আছে, চীন কিছুদিন আগে ভারতের লাদাখ অঞ্চলে ঢুকে ভারতকে প্যাঁদানি দিয়েছিল। চীন লাদাখের ভেতরে বিশাল জায়গা দখল করে সেনাঘাঁটি পর্যন্ত স্থাপন করেছিল। তখন বেশ আলোচিত একটা ঘটনা ছিল এটা। এসবের পেছনে মূল কারণ ছিল কারাকোরাম হাইওয়ে এবং তিব্বতের লাশা টু জিনজিয়াংয়ের কাশগড় হাইওয়ের (G২১৯) চীনা প্রজেক্টের আশপাশে ভারতের সেনাবাহিনী একটু দাদাগিরি করতে চেয়েছিল। বিনিময়ে চীনের সেনা সদস্যরা ভারতের ২০ জনের অধিক সেনা সদস্যকে স্রেফ পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল।

শ্রীলংকাকে সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করার জন্য চীন ১.৫ বিলিয়ন বা ১৫০ কোটি ডলার ঋণ দেয়। এবং চাইনিজ দুটো কোম্পানি বন্দরটি নির্মাণ করে দেয়। ২০১৭ সালে সেই সমুদ্রবন্দর ৯৯ বছরের জন্য ইজারা নেয় চীন।

বাংলাদেশের সাথে চীনের ২০১৬ সালে ২৪ বিলিয়ন বা ২৪০০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি হয়। যা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো অঙ্কের বৈদেশিক ঋণ। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে Belt Road Initiative প্রকল্পের আওতাধীন স্থলপথ (৫ নং করিডোর) হবে। Maritime Silk Road প্রকল্পের আওতাধীন মূল নয়টা গভীর সমুদ্রবন্দরের একটা বন্দর হবে বাংলাদেশে। বুঝতেই পারছেন, One Belt One Road প্রকল্পে বাংলাদেশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

চোরের ওপর বাটপারি

আমেরিকা মিলিটারি বেইজ তৈরি করার জন্য বাংলাদেশের কাছে সেন্টমার্টিন দ্বীপ চেয়েছিল। বাংলাদেশ দেয়নি। এই কথাটা এখন ওপেন সিক্রেট। আওয়ামী লীগ আসলে আমেরিকা ও ভারতকে বিশাল এক টোপ দিয়ে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসেছিল।

বর্তমান আওয়ামী লীগ ছিল আমেরিকান ব্লকে। ভারতেরও বিশ্বস্ত ছিল। চীনকে মোকাবিলা করার প্রজেক্টে বাংলাদেশ আমেরিকান ব্লকের হয়ে কাজ করবে শর্তে আওয়ামী লীগকে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আনে আমেরিকা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আমেরিকাপন্থি অংশটা এতে পূর্ণ সমর্থন দেয়। আয়োজন হয় নির্বাচন নামক একটা নাটকের। জি, ২০০৯ সালের নির্বাচনও ফেয়ার ছিল না। আর এর সবকিছু দেখভালের দায়িত্ব আমেরিকা ভারতকে দিয়েছিল। ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের তখন কুসুম কুসুম প্রেম।

আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল চীনকে মোকাবিলা করতে বাংলাদেশকে ব্যাটেল গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করা। আমেরিকা ভারতকে কাছে টেনেছে চীনের সাথে ভারতের ঐতিহাসিক বিরোধের সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে। ভারত একই কারণে আমেরিকাকে সাহায্য করেছে। তবে এখানে ভারতের আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। ভারত ভেবেছিল—আমেরিকা বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে চীনকে শায়েস্তা করে চলে যাওয়ার পর বাংলাদেশটা একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিত্যক্ত ভূখণ্ডে পরিণত হবে। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ থাকে না। জনগণ থাকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। এ রকম একটা দেশকে খুব সহজে দখল করে নিয়ে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যাবে। পাশাপাশি চীন তো ততদিনে শায়েস্তা হয়ে যাবে। তাই দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতই হবে তখন একমাত্র হিন্দুত্ববাদী পরাশক্তি।

সময়ের সাথে সাথে পানি অনেক দূর গড়িয়েছে। আওয়ামী লীগ বুঝতে পারে অথবা শুরুতেই টের পেয়েছিল যে, আওয়ামী লীগের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে বাংলাদেশকে যুদ্ধের ময়দান বানানোর পরিকল্পনা হয়েছে। তাই আওয়ামী লীগ শুরুতে আমেরিকা ও ভারতের সহায়তায় ক্ষমতায় গিয়ে ধীরে ধীরে চীনের সাথে

সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে থাকে। চীনের সাথে এমন এমনসব চুক্তি করে, যা আমেরিকা ও ভারতের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন :

–ভারতের চিকেন নেকের কাছে চীনের সহায়তায় তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ পরিকল্পনা।

–চীন থেকে সাবমেরিন ক্রয়।

–চাইনিজ সমরাস্ত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করা।

–চীনকে সোনাদিয়া দ্বীপে গভীর সমুদ্রবন্দর করতে দেওয়া।

(যদিও এই প্রকল্প ২০২০-এ বাতিল করা হয়েছে; তবে এটা নিশ্চিত যে, বাংলাদেশের যেকোনো একটা সমুদ্রবন্দর চীনের 'মেরিটাইম সিল্ক রোড'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সম্ভবত পায়রা সমুদ্রবন্দর চীনকে দেওয়া হতে পারে। অনেকের ধারণা, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চীনকে দেওয়া হবে। আমার মতে, সে রকম কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ, প্রথমত, মাতারবাড়ী বন্দর করা হয়েছে জাপানের অর্থায়নে। জাপান আমেরিকান ব্লকের। তা ছাড়া মাতারবাড়ী বন্দর আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত হবে বিধায় চীন তার বাণিজ্যিক কাজে এমনিতেই এটা ব্যবহার করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, মাতারবাড়ী কক্সবাজারেই। মিয়ানমার থেকে কক্সবাজার স্থলপথ খুব অল্প দূরত্বের। এত অল্প পথ অতিক্রম করার জন্য বাংলাদেশকে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; বরং পরিকল্পনা আরও গভীরে। আর সেটা হলো পায়রা সমুদ্রবন্দর। এটা পটুয়াখালীতে। BRI স্থলপথ দিয়ে এই বন্দরে যেতে হবে পদ্মা সেতু দিয়ে। পদ্মা সেতু নির্মাণ হয়েছে না? এই পায়রা বন্দর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের খুব কাছে। পেছনে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্পের আলোচনায় একটা বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে, চীন ভারতকে এই প্রকল্পের দ্বারা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলছে। বিপুল জনগোষ্ঠীর এশিয়ায় বিশাল অর্থনৈতিক বাজার তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে। আগামীতে এশিয়া বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে। সেখানে মোড়ল হবে চীন। সে সময় চীনের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হয়ে উঠবে ভারত। মেধা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ, পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন, বিশাল ভূখণ্ড; এসব মিলিয়ে আজকের ভারতের মধ্যে আগামীর উন্নত ভারত হয়ে ওঠার অপার সম্ভাবনা আছে। তাই চীন আগে থেকেই সতর্ক হচ্ছে।)

–রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা। (এই প্রজেক্ট রাশিয়ার। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, সম্ভবত সেটা চীন সমাপ্ত করবে।)

–চীনকে দিয়ে ঠাকুরগাঁও ও সিলেটে বিমানবন্দর নির্মাণ।

–সবচেয়ে বড়ো চুক্তি–চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' এবং 'মেরিটাইম সিল্ক রোড' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

এই 'বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' এবং 'মেরিটাইম সিল্ক রোড' প্রকল্প শুধু ভারতের সমস্যা না। আমেরিকারও প্রধান মাথাব্যথা এখন চীনের এই ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড। আমেরিকা এই প্রকল্পকে নিজের জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকি মনে করে। আমেরিকার আশঙ্কা হলো, সহজে ব্যবসা-বাণিজ্য করার নামে চীন যেই প্রকল্প হাতে নিয়েছে, মূলত এর উদ্দেশ্য হলো–সামরিক শক্তি বিস্তৃতির মাধ্যমে বিশ্বে চীনের আধিপত্য বিস্তার করা।

আমেরিকার এই আশঙ্কা কিন্তু একেবারে অমূলক না। আপনি যদি বিশ্বের মানচিত্রটা একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন, আমেরিকাকে বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায় এসে মোড়লগিরি করতে হয়। এসবের খরচ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। আমেরিকার একক বার্ষিক সামরিক বাজেট ৭৫০ বিলিয়নের অধিক। সারা বিশ্বের সবগুলো দেশের সামরিক বাজেট একসাথে করলেও আমেরিকার সামরিক বাজেটের সমান হবে না। কেনই-বা হবে? সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমেরিকার ৭৫০টির অধিক মিলিটারি বেইজ আছে। এসব মিলিটারি বেইজে সামরিক সরঞ্জাম আনা-নেওয়ার জন্য সামরিক কার্গো বিমান ও এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারই একমাত্র উপায়।

একেকটা সামরিক কার্গো বিমানের ঘণ্টাপ্রতি অপারেটিং কস্ট প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। লাইট ও হেভি ওয়েট ট্যাংক, লাইট ও হেভি ওয়েট আর্টিলারি, মিসাইল ও মিসাইল লঞ্চার, হামভি, এপিসি ও অন্যান্য মিলিটারি ভেহিক্যাল বহন করা, মিলিটারি ইকুইপমেন্ট, মিলিটারি পারসোনালদের বহন করা, খাদ্য সরবরাহ, ইউনিফর্ম পাঠানো থেকে শুরু করে একটা মিলিটারি বেইজ বানাতে ও তত্ত্বাবধান করতে যা যা দরকার হয়, তার প্রত্যেকটা জিনিস এই কার্গো বিমানে করে আনা-নেওয়া করা হয়।

একেকটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার তৈরি করতেই আমেরিকার খরচ হয় ৪-১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এগুলোর মেইনটেইনেন্স কস্ট তো বাদই দিলাম। বর্তমানে আমেরিকার ১১টা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার অ্যাক্টিভ সার্ভিসে আছে। সমুদ্রে ভাসমান এই ক্যারিয়ারগুলো একেকটা ছোটোখাটো এলাকার সমান। যেখানে স্থলজ রানওয়ে নেই; কিন্তু বিমান হামলা করতে হবে, সেসব জায়গায় যুদ্ধবিমান ওঠানামার জন্য এই ক্যারিয়ারগুলো ব্যবহৃত হয়।

তো, স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকাকে যত খরচ ও কষ্ট করে এদিকে পৌঁছাতে হয়, চীন সেটা স্থল পথেই খুব সহজে পৌঁছে যাবে। যুদ্ধে বিজয় অনেকটাই নির্ভর করে পেছন থেকে পর্যাপ্ত সমরাস্ত্র ও রসদ সরবরাহের ওপর। এপাশে আমেরিকা বনাম চীন যুদ্ধ যদি লেগেই যায়, তবে চীন স্থলজ পথে নিজের সামরিক বাহিনীর কাছে যত দ্রুত ভেঙে ভেঙে সমরাস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করতে পারবে, আমেরিকা তত দ্রুত সেটা পারবে না। কারণ, আমেরিকাকে আসতে হবে একসাথে অনেক সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে কার্গো বিমানে করে; যা আকাশেই ইন্টারসেপ্ট করা যাবে। কিংবা আসতে হবে সমুদ্রপথে; যা ডুবিয়ে দেওয়া যাবে। ভেঙে ভেঙে আলাদাভাবে সমরাস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করার চেয়ে একসাথে অনেক সমরাস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করাটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, শত্রুপক্ষের দ্বারা স্যাবোট্যাজ হলে একবারে অনেক সমরাস্ত্র ও রসদ ধ্বংস হওয়ার সুযোগ থাকে। আর যুদ্ধে জেতার একটা বড়ো কৌশল হলো—শত্রুপক্ষের সমরাস্ত্র ও রসদ সরবরাহ চেইন ভেঙে দেওয়া।

বাংলাদেশের ভেতরে এই প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়ন করবে চীনের সেনাবাহিনী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চিকেন নেকের কাছে, সিলেট সীমান্তে, বঙ্গোপসাগরে চীনের মিলিটারি প্রেজেন্স বৃদ্ধি পাবে। এটা ভারতের জন্য বিশাল এক মাথাব্যথা। মাথাব্যথা বললে কম হয়ে যায়; বরং এটা অশনিসংকেত। কারণ, চীন ভারতকে ধীরে ধীরে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলছে।

ফলে আমেরিকার সাথে তো বটেই; ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। এখন তো ভারতের সাথে যোজন যোজন দূরত্ব। সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত। ভারত ও আওয়ামী লীগের তালাকের বিষয়টা আমি সন্দেহ করা শুরু করি ২০১৭ সালের শেষে অথবা ২০১৮ সালের শুরুতে একটা খবর দেখে। সাধারণ মানুষ তখন এটা কল্পনাও করত না। অধিকাংশ মানুষ ভাবত, আওয়ামী লীগ ও ভারতের প্রেম কুসুম কুসুমই আছে। সে সময় কয়েকজনের সাথে এই তালাকের বিষয়টা

নিয়ে কথা বললে তারা আমার কথা পাত্তাই দেয়নি। তাদের বক্তব্য ছিল–যাহা আওয়ামী লীগ, তাহাই ভারত। পরবর্তী সময়ে দেখলাম, আমার ধারণা অনুযায়ী হিসাব দুয়ে দুয়ে চার মিলে গিয়েছে। এখন তো সেটা সবার কাছেই প্রকাশ্য।

ঘটনাটা সংক্ষেপে একটু বলি। ২০১৬ সালে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী (সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ ও অপসারণ ক্ষমতা সংসদের হাতে থাকবে।) অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করে দেয়। এই সেই এস কে সিনহা, যে কি না ২০১৩ সালে জামায়াতের নেতাদের ফাঁসির রায় দিয়ে আওয়ামী লীগের আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত হয়েছিল। ওটা এমন একটা সময় ছিল–যখন বাংলাদেশের ভারতপন্থি বিচার বিভাগ, বাংলাদেশের ভারতপন্থি প্রশাসন, ভারতপন্থি আওয়ামী লীগ আর ভারতের সাথে গলায় গলায় পিরিত। আওয়ামী লীগ যা করত, ভারতের খুশির জন্য করত। আওয়ামী লীগ যা করত, ভারতের লাভ হতো। বিনিময়ে ভারত ওদের অনুগত বিশেষ একটা ধর্মের অনুসারী সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে দিয়ে হঠাৎ এমন এক রায় দিলো, যা পুরোটাই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গেল। কারণ, আমেরিকা ও ভারতের কাছে বিক্রি হওয়া বিচারপতিরা প্রভুদের ইশারায় এমনসব রায় দিয়ে বসবে, যা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে। বাংলাদেশটা শিক্ষিত স্যার জাফর থুক্কু মিরজাফরে ভরা। এই দালালদেরকে কৃতদাস হিসেবে ব্যবহারের জন্য পশ্চিমারা নিজ হাতে গড়েছে তুলেছে। এই দালালরা জন্মভূমির প্রতি যেমন-তেমন হলেও ভীষণ প্রভুভক্ত। প্রভুদের স্বার্থ রক্ষায় নিজের গাত্র চামড়া এরা উৎসর্গ করে রেখেছে। উদাহরণ হিসেবে পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে দেখুন। তাই পদে পদে ঝুঁকি আছে। তো, আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকরা ভারত ও আমেরিকার এসব কূটচাল আগেই আঁচ করতে পারে।

ক্ষুদ্র হোক অথবা বৃহৎ; কেউই ক্ষমতা হারাতে চায় না। আওয়ামী লীগের কথা হলো, ভারত তোমাকে সব দেব, তবে বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে এবং শুধু আমরাই ক্ষমতায় থাকব। এতে করে লুটপাটের ভাগ অন্যকে দিতে হবে না। কারণ, ভারত বাংলাদেশের অঙ্গরাজ্য হলে এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপি, মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী হবে ভারতীয়রা। বিচার বিভাগের বিচারপতি, প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সরকারি প্রতিটা সেক্টরে থাকবে ভারতীয়দের প্রভাব। তখন এখনকার আওয়ামী লীগ লুটপাট করে খাবে তো দূরের ব্যাপার, একটু ট্যাঁ-ফোঁ করতে

পারবে না। তা ছাড়া আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবের হত্যার পেছনে যে ভারত ও আমেরিকার হাত ছিল, এটা এখন ওপেন সিক্রেট।

শেখ মুজিব স্বাধীনচেতা ছিলেন। অন্য রাষ্ট্রের অনুগত হওয়ার মানসিকতা তার ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত ও আমেরিকার ইশারায় শেখ মুজিব উঠবস করেননি। শেখ মুজিব '৭৪ সালে আমেরিকা, ইউরোপ, ইজরাইল ও ভারতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সংগঠন ওআইসিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন। পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসির সেই সম্মেলনে ফিলিস্তিনের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। যা ইজরাইল ও আমেরিকাকে ক্ষেপিয়েছিল। এর কয়েক মাস পরই আবার ভারতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। '৭৪ সালের শেষের দিকে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশ সফরে এসে শেখ মুজিবের সাথে বৈঠক করে আশানুরূপ ফল পেল না। ফলে '৭৫ সালেই সপরিবারে প্রাণ দিতে হলো। শেখ হাসিনাও তার পিতার মতো; স্বাধীনচেতা। বাংলাদেশের মানুষকে মারবে-কাটবে, জুলুম-অত্যাচার করবে, কিন্তু লেন্দুপ দর্জির মতো নিজ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভারতের মুখ্যমন্ত্রী না হয়ে বরং ক্ষমতা নিজের হাতে রাখবে। শেখ হাসিনা এসব জানে এবং জেনে-বুঝেই ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন পরিকল্পনা নিয়ে ভারত ও আমেরিকার সহযোগিতায় ২০০৯ সালে ক্ষমতায় গিয়ে এরপর ধীরে ধীরে চীনের ব্লকে ঢুকেছে।

স্বাধীনচেতা জিয়াউর রহমানের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। ভারত ও আমেরিকার তাঁবেদার না হওয়ায় তাকেও খুন হতে হয়। বর্তমান দুর্বল বিএনপি আজকে আমেরিকাকে বলুক–তোমাকে বাংলাদেশে মিলিটারি বেইজ করতে দেবো; তাহলে দেখবেন, আগামী নির্বাচনে এই শক্তিহীন বিএনপি জাদুর মতো ক্ষমতায় এসে পড়বে। জনগণের ভোটে ক্ষমতার পালাবদল হয় না। ভোট একটা আই ওয়াশ। উন্নত দেশগুলোতে রহস্যজনক কোনো ইশারায় ক্ষমতার পালাবদল হয়। আর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষমতার পালাবদল হয় উন্নত দেশগুলোর ইশারায়। যারা ওদের কথা না শোনে, তাদেরকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় বসানো হয় ওদের মনের মতো কোনো পুতুল-শাসককে। এসব কূটচাল যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন, ততই মঙ্গল; এতে করে ধোঁকা কম খাবেন। ক্ষতিসাধন হবে কম।

অনুশোচনার অভিনয়

২০১৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি শাহবাগ রচনার পর প্রথমদিকে অনেক বাঙালি মুসলমান শাহবাগীদের সমর্থন করেছিল। কারণ, শাহবাগীদের ওপরের মুখোশটা ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন শাহবাগীদের নাস্তিকতাপূর্ণ ইসলামবিদ্বেষী আসল চেহারাটা উন্মোচিত হতে থাকে এবং সাধারণ মানুষ যখন বুঝতে পারে শাহবাগে ভারতের হিন্দুত্ববাদ মিশে আছে, তখন সবাই এটাকে বয়কট করা শুরু করে। একের পর এক সামনে আসা শুরু করে শাহবাগী নাস্তিক ব্লগার কর্তৃক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, ইসলাম, প্রিয় রাসূল (সা.) ও তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে নোংরা, কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে লেখালেখি; যা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানকে ক্ষেপিয়ে তোলে। একসময় সেই ক্ষোভ আওয়ামী লীগের ওপর পড়ে। কারণ, নাস্তিক ব্লগারদের ইসলামবিদ্বেষী কর্মকাণ্ডে আওয়ামী লীগ নিশ্চুপ ছিল। এমনকি কুখ্যাত রাজিব হায়দারকে জাহান্নামে পাঠানোর পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ওকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ খেতাব দেওয়া হয়। তা ছাড়া ততদিনে সাধারণ মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য শাহবাগ রচনার ভেতরের ইন্ধনদাতা আওয়ামী লীগ এবং মূল নাটের গুরু হলো ভারত।

তথাকথিত মুক্তচিন্তার নামে বদমায়েশ নাস্তিকদের ইসলামবিদ্বেষী নোংরা ব্লগিং তখনও অব্যাহত। আওয়ামী লীগ এসবের বিপক্ষে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বরং নিশ্চুপ থাকে। ফলে নাস্তিকদের দ্বারা ক্রমাগতভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং ধর্মবিদ্বেষী উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে এসবের প্রতিকার চেয়ে ২০১৩ সালের ৫ই মে মুসলমানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে জড়ো হয়। জবাবে বাতি বন্ধ করে দিয়ে নিরস্ত্র মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলাদেশের প্রশাসন। চালানো হয় গণহত্যা। এরপর লাশ গুম।

সেটা কিন্তু কোনো সরকারবিরোধী আন্দোলন ছিল না? ওটা ছিল ব্লাসফেমি আইন করার জন্য সরকারের প্রতি ইসলামপন্থিদের আহ্বান। অর্থাৎ, মুসলমানরা শান্তি চেয়েছিল বলেই সরকারকে অভিভাবক মেনে নিয়ে দাবি তুলেছিল; যেন অন্তত শাহবাগী নাস্তিকরা নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ লেখালেখির মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা বন্ধ করে। বিনিময়ে আওয়ামী লীগ মুসলমানদের বুকে

গুলি চালিয়ে বিশাল একটা জনগোষ্ঠীকে নিজেদের বিরুদ্ধে নিয়ে গেল। এটা যে আওয়ামী লীগের কত বড়ো একটা ভুল ছিল, আওয়ামী লীগ প্রথমে সেটা টের পায়নি।

মানুষ কারও কাছে বিচার চাইতে কখন যায়? যখন বিচার প্রার্থী কাউকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়। বাংলাদেশের নিকট অতীতে এমন নজিরও আছে যে, ইসলামপন্থিদের বড়ো বড়ো আলেমরা পদস্খলিত হয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছে। এখন তো এই পদস্খলনের মাত্রা প্রকট আকার ধারণ করেছে। অর্থাৎ, যে বিষয়টা খুব সহজে সমাধান হতে পারত, সেটা বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ রক্তাক্ত পথে হাঁটল। উপরন্তু, শেখ হাসিনা সংসদে দাঁড়িয়ে সরাসরি গণহত্যার কথা অস্বীকার করে এবং উপহাস করে বলে–রং মেখে শুয়েছিল। আসলে শান্তিপূর্ণ সমাধানের কোনো সদিচ্ছাই আওয়ামী লীগের ছিল না। কেন জানেন?

বস্তুত ওই সময়টা আওয়ামী লীগের প্রথম ক্ষমতাসীন হওয়া। ভারতের সম্পূর্ণ অনুগত। মোড়ল আমেরিকা দক্ষিণ এশিয়ায় ওয়ার অন টেররের বরকন্দাজি দিয়েছিল ভারতকে। ফলে বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে ভার যায় ভারতের হাতে। আগেই বলেছি, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ আমেরিকান ব্লকের হয়ে কাজ করার শর্তে ক্ষমতায় এসেছিল। তাই ওই সময়টা বাংলাদেশের প্রশাসন, মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, আদালত, সংসদ থেকে শুরু করে সরকারের প্রতিটি জায়গায় ছিল ভারতের আধিপত্য। এদিকে ২০১৪-এর নির্বাচন সামনে। আবারও ক্ষমতায় আসতে হবে। তাই মুসলমান মেরে ভারতকে খুশি। মূলধারার ইসলামপন্থিদের মেরে ওয়ার অন টেরর প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আমেরিকাকে খুশি। আমেরিকা খুশি মানে ইউরোপও খুশি। সবাইকে খুশি করে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগও খুশি। পুনরায় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যই এই হত্যাযজ্ঞ।

গণহত্যার বিষয়টা সাধারণ মানুষের কাছে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য প্রচার করা হয়– মূলধারার ইসলামপন্থিরা উগ্রবাদী, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী। এরপর ক্রমাগতভাবে সরকার, দুর্নীতিবাজ প্রশাসন, গৃহপালিত গণমাধ্যম, তথাকথিত সুশীল ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের (এরাও শাহবাগী) পক্ষ থেকে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, টকশোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামপন্থিদের খারাপভাবে উপস্থাপন করা হতে থাকে। মাদরাসাগুলোতে প্রশাসনের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হয়। হকপন্থি আলেমগণকে বন্দি করা

হয়। মুসলিম তরুণদের ধরে ধরে গুম করা হয়। কাউকে কাউকে ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়।

এদিকে দিনের পর দিন বদমায়েশ নাস্তিক ব্লগারদের নোংরা লেখালেখি চলতেই থাকে। আওয়ামী লীগ এই ব্যাপারে তখনও নিশ্চুপ। ২০১৩ সালের ৬ই মে গণজাগরণ মঞ্চ ভেঙে দেওয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো কিছুই তারা করেনি। এটাও করেছিল একপ্রকার বাধ্য হয়ে। কারণ, আগের দিন রাতেই মুসলিমদের রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই গণজাগরণ মঞ্চ ভাঙার মতো এটুকু নাটক করে নিজেকে সাধারণ মানুষের সামনে নিরপেক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করল।

তো কোনো সমাধানই যখন আর হচ্ছিল না, তখন ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬-পরবর্তী তিন বছরের এই সময়জুড়ে আরও কয়েকটা জারজ নাস্তিক ব্লগারকে জাহান্নামে পাঠায় কিছু নির্ভীক মুসলিম তরুণ। জেল, রিমান্ড, গুম, ক্রসফায়ার—কোনো কিছুই যেন ইসলামের এই চেতনাকে থামাতে পারছিল না। বিচার চেয়েও যখন বিচায় পায়নি, তখন মুসলমান নিজের হাতে বিচার তুলে নিতে বাধ্য হয়।

আওয়ামী লীগও দমে যাওয়ার পাত্র নয়। ওই সময়জুড়ে দুর্নীতিবাজ প্রশাসন দিয়ে ধড়পাকড়, গুম, ক্রসফায়ার চালাতে থাকে। গৃহপালিত গণমাধ্যম ও তথাকথিত সুশীলদের দিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আর টকশোতে ইসলামবিরোধী বক্তব্য চলতে থাকে। 'কী কী কাজ করলে আর কী কী কাজ না করলে সন্তান জঙ্গি হয়ে গেছে বুঝবেন'—প্রশাসন থেকে সেসব প্রচার করার মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপারে সচেতন তরুণ-তরুণীদের পেছনে পথভ্রষ্ট অভিভাবকদের লেলিয়ে দেওয়া হয়। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দেখিয়ে বলা হতে থাকে—এগুলো চর্চা করা উগ্রবাদী ও চরমপন্থিদের চিহ্ন। পাঠ্যপুস্তকে নাস্তিক্যবাদী বিষয়বস্তু প্রবেশ করানো হয়। দুনিয়ালোভী কিছু ভণ্ড আলেমদের দিয়ে বিকৃত ইসলাম প্রচার করা শুরু হয়। মোটকথা, ইসলামকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের চোখে খারাপ বানিয়ে ইসলামকে বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ করার একটা পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়।

কিন্তু তাতে কোনোই লাভ হয়নি। ইসলামবিদ্বেষীরা যা যা চেয়েছিল, হয়েছিল ঠিক তার উলটো। কারণ, যেই মাটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য মুসলমানের

রক্তে সিক্ত ও সিঞ্চিত হয়, সেই মাটিতে ইসলামের ফুল ফুটবে না, তা কী করে হয়? এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ওয়াদা।

শাপলায় গণহত্যার পর বাংলাদেশে ইসলামের নবজাগরণ হয়। অনেকটা অলৌকিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান হঠাৎ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করে। আগে এমনটা ছিল না। যা ঘটবে বলে সবাই প্রত্যাশা করেছিল, ঘটতে শুরু করে ভিন্ন কিছু। চারদিকে বেশ জোরেশোরে ইসলামের বাতাস বইতে থাকে। বাঙালি মুসলমান বেশি বেশি ইসলাম চর্চা করতে থাকে। মসজিদে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ে। ইসলাম নিয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ইসলামবিরোধী কোনো কিছু দেখলে আগে যদি হাজারখানেক মুসলমান আওয়াজ তুলত, শাপলা ম্যাসাকারের পর আওয়াজ তোলে লাখ লাখ মুসলমান। আর এখন আওয়াজ তোলে কোটি কোটি মুসলমান। সাধারণ মানুষ ইসলামের দিকে দ্রুত ধাবিত হতে থাকে। ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে। ইসলামবিষয়ক শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা বেড়ে যায়। পিতা-মাতারা সন্তানকে স্কুল-কলেজ বাদ দিয়ে মাদরাসায় ভর্তি করানোর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। জেনারেল পড়াশোনায় শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা ইসলামচর্চায় আরও বেশি অগ্রবর্তী হয়। তরুণ-তরুণীরা অশ্লীলতা, বেহায়পনা, জিনা-ব্যভিচার ছেড়ে দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে।

এর কারণ হতে পারে—হয় বাঙালি মুসলমান সত্যি সত্যিই ইসলামে প্রবেশ করছে, অথবা দীর্ঘদিন পশ্চিমা ও হিন্দু সংস্কৃতিতে জীবনযাপন করে অরুচি চলে এসেছে; তাই নতুন লাইফস্টাইল লাগবে। আবার দুটো কারণই সঠিক হতে পারে। তা ছাড়া ভারতে গরুর গোশত খাওয়ার জন্য মুসলমান পিটিয়ে হত্যা; আমেরিকা ও ন্যাটো কর্তৃক আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া ও লিবিয়ায় চালানো হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য; বাম নাস্তিক কর্তৃক ইসলাম ও রাসূল (সা.)-কে কটূক্তি ইত্যাদি সবকিছু বাঙালি মুসলমানের মনে নিজ ধর্মের চেতনা জাগ্রত করে।

★ আওয়ামী লীগ দেখল, শাপলার ন্যক্কারজনক ঘটনা বাঙালি মুসলমান তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশিকে আঘাত করেছে। এমনকি সেদিন আন্দোলনে যোগ দেয়নি—এমন মুসলমানরাও এই গণহত্যা মেনে নিতে পারেনি। বিশাল জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে তাদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে; যা নিয়ন্ত্রণ করা একসময় সম্ভব হবে না। তা ছাড়া শাপলার ঘটনা নিয়ে ভারত, আমেরিকা ও ইউরোপ মিলে আওয়ামী লীগকে নিজেদের ব্লকে ভিড়ানোর জন্য ব্ল্যাকমেইল করছে। কারণ, ততদিনে আওয়ামী

লীগ দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসে আমেরিকা ও ভারতের ব্লক থেকে ডিগবাজি দিয়ে চীনের ব্লকে ঢুকেছে। ফলে আওয়ামী লীগের আশঙ্কা হলো– শাপলার ওই কালো রাতে ইসলামের যেই বীজ বাংলাদেশের মাটিতে রোপিত হয়েছিল, সেই ফসল ঘরে তুলবে শাহবাগের খলনায়ক জামায়াত অথবা অন্য কোনো ইসলামিক দল।

★ আওয়ামী লীগ দেখল, আমেরিকা তার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তথা বর্ণবাদী ও খ্রিষ্টানদের 'খুশি রাখো' নীতিতে চলছে। ইউরোপের দেশগুলো তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তথা খ্রিষ্টানদের 'খুশি রাখো' নীতিতে চলছে। পাকিস্তান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া ও আরব দেশগুলো তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তথা মুসলিমদের 'খুশি রাখো' নীতিতে চলছে। চীন তার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তথা সমাজতান্ত্রিকদের 'খুশি রাখো' নীতিতে চলছে। মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, জাপান তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তথা বৌদ্ধদের 'খুশি রাখো' নীতিতে চলছে। ভারত তার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তথা হিন্দুদের 'খুশি রাখো' নীতিতে চলছে। আর এদিকে আওয়ামী লীগকে তার নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিপক্ষে লেলিয়ে দিয়ে বাঙালি হিন্দুদের তোষণ করাচ্ছে ভারত। উপরন্তু, অখণ্ড ভারত গড়ার স্বপ্নে বিভোর ভারত বন্ধুর বেশে আওয়ামী লীগকে খেয়ে দেওয়ার চেষ্টায় আছে। আবার ওদিকে আমেরিকা ও ইউরোপ চীন ইস্যুতে ক্ষেপে গিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের হাতে গড়া পাপেট ওভার রেটেড প্রফেসর ড. ইউনুসকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বানাতে চাচ্ছে।

★ আওয়ামী লীগ দেখল, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলাদেশের প্রতি ভারতের নিচু মানসিকতার আচরণে ভারতকে চরম ঘৃণা করে। তারা ভারতের প্রভাবমুক্ত একটা স্বাধীন বাংলাদেশ চায়। আবার এদিকে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিশ্বাস করে যে, ভারতই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে। ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। অথচ গনেশ তো উলটে গেছে সেই কবে! ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপের সহায়তায় ভারতই চায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করতে। পাশাপাশি লুটপাট, অর্থ পাচার, দুর্নীতি ও নানান অনিয়মের কারণে আওয়ামী লীগের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের নাগরিকরা ভীষণ ক্ষেপে আছে।

এমতাবস্থায় পশ্চিমারা একটু উসকানি দিলেই বাংলাদেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করতে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলবে।

এসব ঘটনা মিলিয়ে আওয়ামী লীগ অনেকখানি ব্যাকফুটে চলে গেল। এভাবে চলতে থাকলে আওয়ামী লীগকে দ্রুত উৎখাত হতে হবে। আওয়ামী লীগ একসময় নিজের মহা বোকামি বুঝতে পারল। তাই ইসলামের যেই বীজ বাংলাদেশে রোপিত হয়েছে, আওয়ামী লীগ সেই ফসল হাতছাড়া না করে ঘরে তুলতে চাইল; যা তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকাকে দীর্ঘায়িত করবে। এরপর হঠাৎ করে আওয়ামী লীগ নিজের রংটা বদলে ফেলল। কওমি সনদ দিলো, মাদরাসায় অনুদানের নামে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বাড়াল, দুনিয়ালোভী আলেমদের মোটা অঙ্কের বিনিময়ে খরিদ করল, পাঁচশতের অধিক মডেল মসজিদ বানাল, মদিনার সনদে দেশ চলবে বলল, মন্ত্রী-এমপিরা ইসলামি কথাবার্তা বলতে লাগল, আলেমদের থেকেও তারা বেশি ইসলাম শিখেছে–বিভিন্ন সভা-সেমিনারে সেসব বলতে থাকল, সংসদ অধিবেশনে এমপিরা সম্মিলিত মোনাজাত করা থেকে নিয়ে আরম্ভ করে কুরআন-হাদিসের প্রসঙ্গ টেনে আনতে থাকল, 'তাহাজ্জুদের নামাজ' 'কুরআন তিলাওয়াত' ইত্যাদি কথার চাউর তুলল, লোকদেখানো ইসলামচর্চা আরম্ভ করল, বেশি বেশি দুআ-মাহফিলের আয়োজন করতে থাকল, বিভিন্ন দিবসে সরকারি কর্মকর্তারা ইসলামিক বক্তব্য দেওয়া শুরু করল, হিন্দুপ্রীতি কমিয়ে দিলো, শাহবাগ রচনাকারী আওয়ামী লীগ ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ডিগবাজি দিয়ে ইসলামি জোব্বা গায়ে দিলো, বাম নাস্তিকদের ওরফে শাহবাগীদের ব্যবহৃত টয়লেট টিস্যুর মতো ছুড়ে ফেলে দিলো, শেখ হাসিনা নিজে সরাসরি বাম নাস্তিক ব্লগারদের ইসলামবিদ্বেষী লেখালেখির কঠোরভাবে তিরস্কার করল, আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়িয়ে দিলো।

এমনকি ২০১৬ সালের পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, 'আমার ধর্ম সম্পর্কে কেউ যদি নোংরা কথা লেখে, সেটা কেন আমরা বরদাশত করব?' ফ্যাশন দাঁড়িয়ে গেছে–ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু লিখলেই তারা মুক্তচিন্তার ধারক! কিন্তু আমি এখানে কোনো মুক্ত চিন্তা দেখি না। আমি দেখি নোংরামি। এত নোংরা নোংরা কথা কেন লিখবে? আমি আমার ধর্ম মানি, যাকে আমি নবি মানি, তাঁর সম্পর্কে নোংরা কথা কেউ যদি লেখে, সেটা কখনোই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ঠিক তেমনি অন্য ধর্মের যারা তাদের সম্পর্কে কেউ কিছু লিখলে তাও কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। যারা এগুলো করে, তা

তাদের সম্পূর্ণ নোংরা মনের পরিচয়, বিকৃত মনের পরিচয়। এটা পুরোপুরিই তাদের চরিত্রের দোষ এবং তারা বিকৃত মানসিকতার। একজন মুসলমান হিসেবে আমি প্রতিনিয়ত আমার ধর্মকে অনুসরণ করে চলি। কাজেই, সে ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ লিখলে আমি কষ্ট পাই। এসব লেখার জন্য কোনো অঘটন ঘটলে তার দায় সরকার নেবে না। সবাইকেই সংযমতা নিয়ে চলতে হবে, শালীনতা বজায় রেখে চলতে হবে। অসভ্যতা কেউ করতে পারবে না। আর তা করলে তার দায়িত্ব আমরা নেব না।

এতে করে বাংলাদেশের বাম নাস্তিক ওরফে শাহবাগীদের একটা বড়ো অংশ ও হিন্দুরা আওয়ামী লীগের ওপর ভীষণ ক্ষেপে গেল। বাংলাদেশের বাম নাস্তিক ওরফে শাহবাগীরা এরপর দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আওয়ামীপন্থি বাম। যেমন : ড. সলিমুল্লাহ খান, ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, আনু মোহাম্মদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, চৌধুরী জাফরুল্লাহ, জাফর ইকবাল, শাহরিয়ার কবির, নুরুল কবির ইত্যাদি। এই দলটা ছোটো। মজার বিষয় হলো, কোনো হিন্দু বংশোদ্ভূত বাম (পড়ুন ছুপা রাম) এই দলে নেই। আরেক দল আমেরিকা ও ভারতপন্থি বাম। যেমন : আসিফ নজরুল, পিনাকী ভট্টাচার্য, জিয়া হাসান, ফাহাম আব্দুস সালাম, তাজ হাশমি, জুনায়েদ সাকি, সুলতানা কামাল, ড. কামাল হোসেন, ড. রেজা কিবরিয়া, তাসনীম খলিল ইত্যাদি। অনলাইন ও অফলাইনের সকল তরুণ বাম নাস্তিক অ্যাক্টিভিস্টরা আমেরিকা ও ভারতপন্থি।

তবে এখানে একটা টুইস্ট আছে। এই বামদের কেউ কেউ ওপরে আওয়ামীপন্থি, ভেতরে আমেরিকাপন্থি। আবার কেউ কেউ ওপরে আমেরিকাপন্থি, ভেতরে আওয়ামীপন্থি। আবার আওয়ামী লীগ দলের ভেতরে কিছু মন্ত্রী-এমপি-নেতা-পাতিনেতা আছে, যারা কি না আমেরিকা ও ভারত ব্লকের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে অথবা নারীঘটিত বিষয়ে ধরা খেয়ে ব্ল্যাকমেইল্ড হচ্ছে। এই বিক্রি হওয়া মন্ত্রী-এমপি-নেতা-পাতিনেতাদেরকেই আওয়ামী লীগ কিছুদিন পরপর ধরে ধরে সাইজ করে সাধারণ জনগণকে একটু শান্ত রাখে।

এখানে আরও একটা টুইস্ট আছে। আওয়ামী লীগ বিরোধী সব পক্ষই কিন্তু আমেরিকা ও ভারতপন্থি না। এদের মধ্যে একটা অংশ আছে যারা কি না আওয়ামী লীগ, আমেরিকা, ভারত–এই সবগুলোর বিরোধী। এই পক্ষটা টুকটাক নামাজ-রোজা করলেও সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী এবং গণতন্ত্র ও মানবরচিত সংবিধানের

ধারক-বাহক। এই পক্ষটা বাংলাদেশের তৃতীয় একটা লুক্কায়িত শক্তি। তারা হলো মূলত চীনপন্থি। তাদের শিকড়টা সেনাবাহিনীর হাতে। বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ, মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, প্রশাসন, অর্থনীতি, ব্যবসা, শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম ইত্যাদি সব জায়গায় এই পক্ষের অদৃশ্য একটা আধিপত্য আছে। বাংলাদেশে ক্ষমতার আসন উলটে দিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার মতো সক্ষমতা এই তৃতীয় পক্ষটার আছে। এই দলের কিছু পাবলিক ফেইস আছে। যেমন : ইলিয়াস হোসাইন, কনক সারওয়ার, মাহমুদুর রহমান, ফরহাদ মজহার ইত্যাদি।

যাহোক, আগের আলোচনায় ফিরি। একসময় যেই বাম নাস্তিকদের ওরফে শাহবাগীদের এবং হিন্দুদের আওয়ামী লীগ আশ্রয়-প্রশ্রয় দিত, দুধ-কলা খাইয়ে পেলে-পুষে রাখত, রাতারাতি সেই বাম নাস্তিক ও হিন্দুরা ঘোরতর আওয়ামী লীগবিরোধী হয়ে গেল। ওরা তখন যেতে-আসতে আওয়ামী লীগকে বিষাক্ত সাপ হয়ে কাটা শুরু করল; এখনও কাটছে। বাঙালি মুসলমানদের রক্ত চুষিয়ে যেই হিংস্র প্রাণী আওয়ামী লীগ এতদিন পুষেছে, সেই হিংস্র প্রাণীই এখন আওয়ামী লীগকে ছিঁড়ে খেতে চাচ্ছে।

আমেরিকা ও ভারতের আওয়ামী লীগবিরোধী তথা বাংলাদেশবিরোধী সকল অ্যাজেন্ডা এই দেশের ভেতরে বাম নাস্তিক এবং হিন্দুরা ফুট সোলজার হয়ে বাস্তবায়ন করে। দেশের ভেতরে ধর্মীয় ইস্যু থেকে নিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামজিক, দুর্নীতি, অর্থপাচার ইত্যাদি সকল বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান এদের। আর সুযোগ পেলেই মুসলমানদের 'ধর্মান্ধ', 'সাম্প্রদায়িক', 'মৌলবাদী' বলে হাউকাউ করে। কুরবানি, সিয়াম, সালাত, পর্দা ইত্যাদি ইবাদত ও মাদরাসার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে। এদের অনেকে আবার রিফিউজি ভিসা নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে অবস্থান করে আওয়ামী লীগবিরোধী অ্যাক্টিভিজম করছে তারা।

তাই আওয়ামী লীগ আমেরিকাপন্থি বাম নাস্তিকদেরকে ওরফে শাহাবাগীদেরকে বাংলাদেশের ভেতরে কোনো আন্দোলন করতে দেখলেই পিটিয়ে পশ্চাদ্‌দেশ লাল করে দেয়। জেলে আটকায়। যেমন : মুশতাক আহমেদ, কার্টুনিস্ট কিশোর, শহিদুল আলম, ইমরান এইচ সরকার ইত্যাদি। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ হিন্দু তোষণও অনেকটা কমিয়ে দিলো। প্রশাসন ও সরকারি কার্যালয়ে ঊর্ধ্বতন হিন্দু কর্মকর্তাদের কয়েকটাকে ধরে সাইজ করে দিলো। যেমন : বিচারপতি এস কে সিনহা, পিকে হালদার, ডিআইজি প্রিজন পার্থ গোপাল, ওসি প্রদীপ ইত্যাদি।

এর মানে এই নয় যে, আওয়ামী লীগের ইসলামপ্রীতি বেড়েছে অথবা আওয়ামী লীগ মুসলিম শাসক হয়ে গিয়েছে। আওয়ামী লীগ যা ছিল, তা-ই আছে; চিপায়

পড়ে শুধু ওপরের রংটা বদলেছে। তারা এখনও মূলধারার ইসলামপন্থিদের দমন করছে। ইসলামপন্থিরা কোনো আন্দোলন করলে বডি লাইন গুলি করে মুসলমানদের হত্যা করছে। তবে কাজগুলো করছে আগের থেকে কিছুটা কৌশলী হয়ে, ইসলামি জোব্বা গায়ে দিয়ে; যেন ইসলামবিরোধী তকমা গায়ে না লাগে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের ইসলামের প্রতি ধাবিত হওয়ার ঝোঁকটাকে আওয়ামী লীগ কাজে লাগাচ্ছে। মডারেট ইসলাম দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের মন জুগিয়ে চলছে। অর্থাৎ, আওয়ামী লীগ সেক্যুলার এরদোগান ও সেক্যুলার ইমরান খান ধাঁচের তথাকথিত মুসলিম শাসক হওয়ার ভান করছে।

এতে লাভ দুটো। **এক.** সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বাংলাদেশি সরকারবিরোধী হবে না। ফলে ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হবে। **দুই.** হিন্দুত্ববাদী ভারত ও খ্রিষ্টান পশ্চিমারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিজেদের পাপেট শাসক বসিয়ে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ দখল করতে চাইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণকে পাশে পাওয়া যাবে। কারণ, বাঙালি মুসলমান ভাববে, আমাদের মুসলমান শাসককে হিন্দু ও খ্রিষ্টান রাষ্ট্র মিলে অপসারণ করতে চাচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখেন না, জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্ন স্তরে বাস করবে–এমন কিছু আলেম নামের মুনাফিক আওয়ামী লীগকে মুসলিম শাসক বলে বক্তৃতা দেয়!

উপরন্তু, দেশে যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি হলে অথবা আমেরিকা ও ভারত আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিলে আওয়ামী লীগের কাছে বিক্রি হওয়া দুনিয়ালোভী আলেমদের দিয়ে মূলধারার ইসলামপন্থিদের জিহাদের নামে ভারত ও আমেরিকার সেনাবাহিনীর বিপক্ষে কাজে লাগানো যাবে। কারণ, আওয়ামী লীগের চামচারা কেউই তখন আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে প্রাণ দেবে না। সেই মুরোদ ওই চামচাদের নেই। চামচা মানেই যতদিন সুযোগ আছে খাবে, সুযোগ না থাকলে কেটে পড়বে। আওয়ামী লীগ করে যেই অর্থসম্পদ ওই চামচাগুলো কামিয়েছে, সেগুলো ফেলে রেখে ওরা আওয়ামী লীগের জন্য মরতে আসবে কোন দুঃখে? সম্পদ তো মানুষ মরার জন্য কামাই করে না; ভোগ করার জন্য কামাই করে। তাই শেষ ভরসা ওই মূলধারার ইসলামপন্থিরাই। ওরা ওরা মারামারি করে মরবে। আর মাঝখান থেকে আওয়ামী লীগের পোয়াবারো। এতে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হয়ে যাবে।

সাবধান ! ওরা ধোঁকাবাজ

ইসলামপন্থিদের উদ্দেশ্যে বলছি, 'আপনাদের শত্রুর শত্রু আপনাদের বন্ধু'—এটা চিরন্তন সত্য নয়। ক্ষেত্রবিশেষে এর ধরন বদলায়। আপনাদের শত্রুর শত্রু আপনাদেরও শত্রু হতে পারে; এমনকি আরও বড়ো শত্রু হতে পারে। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষ হিসেবে আপনারা যদি উভয় শত্রুর তুলনায় দুর্বল হন, তাহলে এর ফলাফল দাঁড়ায়—লড়াইয়ের মাঠে আপনারা একটা বল। দু-পক্ষই আপনাদেরকে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করবে। বাগে পেয়ে গেলে নিজেদের মতো ব্যবহার করবে। সুযোগ বুঝে আপনাদের বুকে লাথি দিয়ে আপনাদের অপর পক্ষের জালে পাঠানোর মাধ্যমে অপর পক্ষকে ঘায়েল করবে।

উদাহরণটা অন্যভাবে দিলে—আপনারা একটা লাঠি। লাঠিটা মাঝখানে। দু-পাশে দুটো প্রতিপক্ষ। দু-পক্ষই সুযোগে আছে লাঠিটা যেকোনো উপায়ে দখলে নেওয়ার। যে-ই লাঠিটা আগে নিতে পারবে, সাথে সাথে প্রতিপক্ষের মাথায় বাড়ি বসিয়ে দেবে।

এরপর? এরপর আর কী, ব্যবহৃত পুরোনো রুমালের মতো আপনাদেরকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে।

অর্থাৎ, জঙ্গলে যাবেন আপনারা, ঝোপ কাটবেন আপনারা, সাপের গর্তে হাত দেবেন আপনারা, সাপের কামড় খাবেন আপনারা, বিষে নীল হয়ে মারা যাবেন আপনারা; সবই করবেন আপনারা, মাঝখান থেকে লাভবান হবে যেই শত্রুপক্ষটা আপনাদেরকে বাগে নিতে পেরেছিল।

গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের মাধ্যমে কোনো শাসককে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে হয়। গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লব সাধারণ কোনো মিছিল বা আন্দোলন বা অনশন না। বিপ্লব বা গণ-অভ্যুত্থানে রক্ত ও প্রাণ দেওয়া লাগে। 'রক্ত ও প্রাণ দিয়ে হলেও এই শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করবই'—এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠী রাজপথে নামে। হাতে অস্ত্রও তুলে নিতে হয়।

বর্তমান আওয়ামী লীগ এমন একটা শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছে–যাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে ছোটোখাটো মিছিল বা আন্দোলনে কাজ হবে না। গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লব ঘটাতে হবে। এমনকি আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারত প্রাথমিক পর্যায়ে সরাসরি বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করবে না। তারা প্রথমে বিভিন্ন রকম কূটচাল চেলে বাংলাদেশিদের আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। এরপর বলবে–তোমরা মাঠে নামো। আমরা তোমাদের সাথে আছি। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মাঠে নামবে। আওয়ামী লীগ বডি লাইন গুলি করে হত্যা করবে। সাধারণ মানুষ আরও ক্ষেপে যাবে। এরপর নিরুপায় হয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আমেরিকা ও ইউরোপকে বলবে–আমাদেরকে ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরশাসক থেকে মুক্ত করো। ব্যস! কেল্লা ফতে। আমেরিকা, ইউরোপ তো এই অপেক্ষায়ই বসে ছিল। বিড়ালের মতো শুধু মাথাটা ঢোকাতে পারলেই চলে; বাকি শরীরটাও একসময় ঢুকিয়ে দেবে। ওরা অধিকাংশ বাংলাদেশিদের সমর্থন পেয়ে বাংলাদেশে নিজেদের সেনাবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করবে। সাথে থাকবে ভারতের সেনাবাহিনী। মুখে থাকবে 'বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করতে এসেছি'; অন্তরে থাকবে 'চীনকে মোকাবিলা করতে এসেছি'। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এতে বাধা দেবে। শুরু হবে যুদ্ধ। এভাবে বাংলাদেশটা আফগানিস্তান-ইরাক-সিরিয়া-লিবিয়ায় পরিণত হবে।

কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে মাঠে নেমে রক্ত ও প্রাণ দেওয়ার কাজটা কারা করবে? বর্তমান বিএনপি? বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল? উঁহু। বিশটা বিএনপি এবং সকল রাজনৈতিক দল একত্রে হলেও গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম নয়। পশ্চিমা দেশগুলোতে আশ্রয়ে থেকে যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলছে, তারাও বিএনপি ও অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে নানান কর্মসূচি, অমুক-তমুক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও, মাঠে নেমে রক্ত ও প্রাণ কেউই দেবে না। কারণ, তাদের সেই সাহস, শক্তি, লোকবল ও চেতনা নেই।

তাহলে হাতে উপায় একটাই। যেকোনোভাবে ইসলামপন্থিদের রাজপথে নামিয়ে গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লব ঘটানো। কারণ, ইসলামপন্থিরা সাহসী ও নির্লোভ। তারা সংখ্যায় অনেক। তাদের দুনিয়াপ্রীতি নেই। ইসলামের জন্য রক্ত দেওয়ার মতো চেতনা তারা লালন করে। ওদের শুধু এটাই দরকার। কারণ, ওরা সাপ মারবে, কিন্তু নিজেরা গর্তে হাত দেবে না। অন্যদের দিয়ে গর্তে হাত দেওয়াবে। এতে উভয় দিকেই লাভ। শত্রু হিসেবে বড়ো প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা গেল। পাশাপাশি

ইসলামপন্থিদের মতো 'ছোটো তবে ভীষণ ঝাল' মরিচগুলোকেও শেষ করা গেল। এটাকে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার বলে না। এটাকে বলে কোনো ঢিল না ছুড়েই দুটো পাখি শিকার। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা প্রবাদটার মতো।

অর্থাৎ, ক্ষমতাসীন পক্ষ ও ক্ষমতাহীন পক্ষ—উভয়ে একই মতাদর্শের অনুসারী। ক্ষমতাহীনরা ক্ষমতাসীনদের ঘায়েল করতে ব্যবহার করবে উভয়ের চিরশত্রু ইসলামপন্থিদের। রক্ত ও প্রাণ দিয়ে এক দানবের মোকাবিলা করবে ইসলামপন্থিরা, আর কার্য হাসিল হওয়ার পর ইসলামপন্থিদের কাঁচকলা দেখিয়ে পুরো গুড়টা খাবে নতুন আরেক দানব।

এজন্যই দেখবেন—আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতপন্থি বাম নাস্তিকরাও ইসলামের পক্ষে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বাঙালি মুসলমানদের মন জোগানোর চেষ্টা করছে এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলে সরকার পতনের আন্দোলনের উসকানি দিচ্ছে। আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতকে মোকাবিলা করতে এই একই চাল চেলে আওয়ামী লীগ নিজেও কিন্তু ইসলামিক জোব্বা গায়ে দিয়েছে।

বিষয়টাকে একটু বিস্তারিতভাবে না বললেই নয়। মাঝে মাঝে দেখা যায়, ইসলামিক কোনো ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের মুসলিমদের শাহবাগী বামদের একটা অংশ কটাক্ষ করলে শাহবাগী বামদের অপর অংশটা মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে কটাক্ষকারী শাহবাগী বামদের ধুয়ে দেয়।

কটাক্ষকারী শাহবাগী বামরা হলো—কট্টর ও চরমপন্থি বাম, ইসলামবিদ্বেষী, চরমপন্থি সেক্যুলার, হিন্দুত্ববাদের ঘেটুপুত্র, বেকুব। এদের জ্ঞানের আওয়াজের চেয়ে গলার আওয়াজ বেশি। এককথায়, এরা হলো থার্ডক্লাস বাম। বাংলাদেশে এদের আরেক নাম কলাবিজ্ঞানী। একে তো বেকুব হওয়ার কারণে বাংলাদেশের মুসলমানদের ঘিরে চতুর বামদের কঠিন চাল এরা ধরতে পারে না; দ্বিতীয়ত, কট্টর বাম (পড়ুন ইসলামবিদ্বেষী) ও হিন্দুত্ববাদের ঘেটুপুত্র হওয়ার কারণে মুসলিমদের কোনো কাজকেই এরা সহ্য করতে পারে না। এই দলে আমেরিকা ও ভারতপন্থি বাম আছে, আবার আওয়ামীপন্থি বামও আছে। কিছু পত্রিকা ও নিউজ চ্যানেলও আছে।

চতুর শাহবাগী বামরা হলো—উদার বাম, নরমপন্থি সেক্যুলার, বুদ্ধিমান। বামদের এই অংশটা জ্ঞানী। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানকে ঘিরে তাদের পরিকল্পনা

খুব সূক্ষ্ম ও দীর্ঘমেয়াদি। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এই দেশের মুসলিমদের ক্ষতির পরিমাণ হবে অনেক বেশি। তারা একেবারে গভীর থেকে ক্ষয় করবে। শিকড় নষ্ট করে দেবে; কোনো হাউকাউ করে বা কটু বাক্য দিয়ে না, মুখের মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে। সুঁই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোবে। বাঙালি মুসলমান আবেগী জাতি। চতুর বামরা এই আবেগটাকে নিয়েই খেলবে। এই দলে আমেরিকা ও ভারতপন্থি বাম আছে, আবার আওয়ামীপন্থি বামও আছে। কিছু পত্রিকা ও নিউজ চ্যানেলও আছে।

অর্থাৎ, শাহবাগী বাম নাস্তিক দুই প্রকার। এই দুই প্রকারের মধ্যে আছে আরও দুটো ভাগ।

১. আওয়ামীপন্থি শাহবাগী বাম।

ক) চরমপন্থি শাহবাগী বাম

খ) চতুর শাহবাগী বাম

২. আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতপন্থি শাহবাগী বাম।

ক) চরমপন্থি শাহবাগী বাম

খ) চতুর শাহবাগী বাম

চতুর শাহবাগী বামদের এই অংশটা খুব বুদ্ধিমান। এই অংশটা জানে যে, মডারেট মুসলিম মানে বিড়াল। মূলধারার ইসলামের সাথে মডারেট মুসলিমদের যোজন যোজন দূরত্ব। সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ৯০% আইনকানুন-রীতিনীতি-প্রথা মডারেট মুসলিমরা সেচ্ছায়ই পালন করে। তারা রোজা-নামাজ করে, হজ-কুরবানি করে। অন্যদিকে আবার পূজায় যায়, দিবস উদ্‌যাপন করে, বড়দিনে শুভেচ্ছা জানায়, পহেলা বৈশাখে যায়, বিয়েশাদিতে মদটদ খেয়ে নাচগান করে, বেপর্দা নাটক-সিনেমা-গানবদ্য দেখে, কখনো পর্দা করে কখনো বেপর্দা হয়ে বের হয়, মাহরাম-গায়রে মাহরাম মানার ধারেকাছে নেই ইত্যাদি লম্বা ফিরিস্তি। এ রকম মডারেট মুসলিমদের সাথে ওই চতুর বামদের কোনো সংঘর্ষ নেই; বরং সেক্যুলাররা তো এটাই চাই। কারণ, এটাই তো সেক্যুলারিজম।

আগেও বলেছি, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান মডারেট মুসলিম এবং আমেরিকা ও ভারতবিরোধী। তো, চতুর বামরা (১.খ) নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে এ রকম রেডিমেড একটা জনগোষ্ঠীকে কায়দা মতো কবজায় নিয়ে আমেরিকা ও ভারতের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা ও ভারতকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করার এই সুযোগ তারা কেন হাতছাড়া করবে? তা ছাড়া আমেরিকা ও ভারতকে মোকাবিলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানকে নিজেদের পক্ষে রেখে দল ভারী করার কোনো বিকল্প নেই। এজন্যই দেখবেন, ড. সলিমুল্লাহ খান বাঙালি মুসলমানদের ব্যাপারে আগে ছিল বেশ গরম, তবে এখন অনেকটা নরম। সে একদিন শাহরিয়ার কবিরকে ওয়াশ করে, আরেক দিন সে হুমায়ুন আজাদকে ওয়াশ করে। পশ্চিমাদের সমালোচনায় সে মুখোর।

একইভাবে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান মডারেট মুসলিম এবং আওয়ামী লীগবিরোধী। তো, চতুর বামরা (২.খ) নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে এ রকম রেডিমেড একটা জনগোষ্ঠীকে কায়দা মতো কবজায় নিয়ে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার এই সুযোগ তারা কেন হাতছাড়া করবে? তা ছাড়া আওয়ামী লীগকে মোকাবিলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানকে নিজেদের পক্ষে রেখে দল ভারী করার কোনো বিকল্প নেই। এজন্যই দেখবেন, পিনাকী ভট্টাচার্য মুসলিমদের মুখপাত্রের মতো কথা বলে। কখনো জাফর ইকবালকে ধুয়ে দেয়। কখনো সিপিবিকে ধুয়ে দেয়। কখনো-বা মোদিকে ধুয়ে দেয়।

তবে, যেহেতু আওয়ামী লীগ নাস্তিকদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এতদিনে নিজেকে সুগার কোটিং করে বাংলাদেশের মুসলমানের কাছে ভালো সেজে ফেলেছে, আর বাংলাদেশের মুসলমানরা আওয়ামী লীগের চেয়ে আমেরিকা ও ভারতকে বেশি ঘৃণা করে, তাই আমেরিকাপন্থি চতুর বামরা (২.খ) ইসলামপন্থিদের নিজেদের কবজায় নেওয়া ব্যাপারে একটু বেশি সরব। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশির সমর্থন নিতে হলে তাদের হাতে এ ছাড়া আপাতত আর কোনো উপায় নেই।

আরেকটা বিষয় হলো, আওয়ামীপন্থি চতুর বামদের (১.খ) সাথে আবার আমেরিকাপন্থি চতুর বামদের (২.খ) সম্পর্ক এক্কেবারে খারাপ। খারাপ হওয়াটাই

তো স্বাভাবিক। কারণ, তারা দুটো বিপরীত পক্ষের হয়ে মাঠে নেমেছে। উদ্দেশ্য অপর পক্ষকে কুপোকাত করা।

আমেরিকাপন্থি চতুর বামদের সব আশার গুড়ে বালি দিয়ে দেয় আওয়ামীপন্থি ও আমেরিকাপন্থি চরমপন্থি বামরা। আমেরিকাপন্থি চতুর বামেরা ইসলামের পক্ষে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, পিঠে হাত বুলিয়ে, তেলটেল মেরে, মডারেট মুসলিমদের যেই না একটু দলে ভেড়ায়, ওমনি উভয়পন্থি চরমপন্থি বামরা হঠাৎ একটা ইস্যু তুলে ইসলামের প্রতি নোংরা মন্তব্য, কটুকথা, ঘৃণা-বাক্য ছড়িয়ে মডারেট মুসলিম সহ গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ সেক্যুলারগোষ্ঠীর বিপক্ষে ক্ষেপিয়ে তোলে। কারণ, সাধারণ মানুষ তো অতশত বোঝে না যে–কে আওয়ামীপন্থি শাহবাগী বাম আর কে আমেরিকাপন্থি শাহবাগী বাম। শাহবাগী বামরা যে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে সেই কবে। সেটা বেশির ভাগ বাঙালি মুসলমান ঠাহরই করতে পারেনি। তাই, কোনো এক শাহবাগী বাম ইসলাম নিয়ে কটু কথা বললে সেই দায় সব শাহবাগী বামদের গায়ের ওপর পড়ে যায়।

এতে করে বেশি লোকসান হয় আমেরিকাপন্থি বামদের। কারণ, যেহেতু দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতি করার ফলে আওয়ামী লীগের ওপর বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই ক্ষেপা, তাই আমেরিকাপন্থি চতুর বামরা আওয়ামীপন্থি চতুর বামদের তুলনায় সাধারণ বাংলাদেশিদেরকে নিজেদের পক্ষে বেশি কাজে লাগাতে পারবে এবং পারছেও। আওয়ামী লীগ এসব ভালো করেই বোঝে। তাই মাঝে মাঝে আওয়ামী লীগ ইচ্ছেকৃতভাবে আওয়ামীপন্থি চরমপন্থি শাহবাগী বামদের দিয়ে ইসলামের বিপক্ষে ঘৃণা বাক্য ছড়ায়; যেন ইসলামপন্থিদের সাথে সকল বামদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ফলে ইসলামপন্থিরা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা থেকে কোনো বামদের সাথেই আর একত্র হয়ে আওয়ামী লীগবিরোধী আন্দোলন করতে নামবে না।

উপরন্তু, মুসলমানের রক্তে মাখা হাতটা ধুয়ে-মুছে নিজেকে সুগার কোটিং করে ইসলামি জোব্বা তো আওয়ামী লীগও গায়ে দিয়েছে। ফলে দেখা যায়, আমেরিকাপন্থি চতুর বামরা যেই ফলটা খাবে বলে আশা করে রেখেছিল, সেই ফলটা আওয়ামী লীগ খেয়ে নেয়। এভাবে চলতে থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান নামক গোটা গাছটাই আওয়ামী লীগ একদিন সাবাড় করে দেবে।

ঘটনার রহস্যজনক টুইস্ট কিন্তু এখানে। বাম নাস্তিকদের দুটো পক্ষই কিন্তু শাহবাগের ফুট সোলজার ছিল। অথচ আমেরিকাপন্থি চতুর শাহবাগী বামরা এখন চরমপন্থি বামদের 'শাহবাগী' বলে গালি দেয়। তারা মায়াকান্না জুড়ে দিয়ে বলে– শাহবাগে যাওয়া তাদের ভুল ছিল। সেদিন শাহবাগে না গেলে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের জন্ম হতো না। রাষ্ট্রের বিচারিক ও প্রশাসনিক ইনস্টিটিউটগুলো তথা রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস হতো না। তাই তারা অনুশোচনাভরে শাহবাগ থেকে ফিরে এসেছে।

অথচ বাস্তবতা হলো, এদের এসব কথা পুরোটাই ধোঁকা। 'শাহবাগ কী', সেটা আমেরিকাপন্থি শাহবাগীসহ সকল শাহবাগীই ভালো করে জানত। শাহবাগ তৈরি না হলেও আওয়ামী লীগ এখনকার মতোই একটা দানবে পরিণত হতো। কারণ, ফাঁসি দেওয়া জামায়াতের নেতা মানেই বাংলাদেশের রাজনীতির সমগ্র ময়দান নয়। জামায়াত মানেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল ইনস্টিটিউট নয়। আসল ব্যাপারটা হলো, তারা শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাচ্ছে। তারা অন্তরে এক রকমের উদ্দেশ্য নিয়ে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করছে, আর ইসলামপন্থিদের সামনে প্রকাশ করছে ভিন্ন রকমের উদ্দেশ্য।

ভারতের প্রত্যক্ষ ইশরায় পরিচালিত শাহবাগ ধীরে ধীরে একটা নৈরাজ্যবাদী দল হয়ে উঠেছিল। শাহবাগীরা নিজেদেরকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চেয়েও বড়ো কিছু ভাবতে শুরু করেছিল। তাই ওরা একের পর এক কর্মসূচি দিত। জাতীয় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ সরকারের কী করা উচিত আর কী করা উচিত না, সেই ব্যাপারে ওরা দিকনির্দেশনা দেওয়া শুরু করেছিল। যেই উদ্দেশ্যে শাহবাগীরা প্রথম দিন শাহবাগে এসেছিল, একসময় সেই উদ্দেশ্য একেবারে গৌণ হয়ে গেল। অর্থাৎ, ওপরে অরাজনৈতিক জামা পরে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে দিয়েছিল। বিশেষ করে শাহবাগীদের চার ভাগের তিন ভাগই আমেরিকা ও ভারতপন্থি। ফলে শাহবাগী বাম নাস্তিকরা একসময় আওয়ামী লীগের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আওয়ামী লীগ শাহবাগীদের যতদিন পর্যন্ত গুড় খাইয়েছে, ততদিন আওয়ামী লীগ ওদের কাছে ভালো ছিল। যেদিন গণজাগরণ মঞ্চ ভেঙে দিলো, সেদিন ওদের কাছে আওয়ামী লীগ একটু খারাপ হলো। পাকিস্তান দূতাবাস ঘেরাও করতে গিয়ে যখন পুলিশের হাতে প্যাঁদানি খেল, সেদিন ওদের কাছে আওয়ামী লীগ আরও একটু খারাপ হলো। এরপর ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালের সময়টাজুড়ে

আওয়ামী লীগ ইসলামপন্থিদের সাথে একটু একটু করে ঘেঁষতে থাকে, আর শাহবাগীদের কাছে আওয়ামী লীগ একটু একটু করে খারাপ হতে থাকে। শেষমেশ ২০১৬ সালের পহেলা বৈশাখের সংবাদ সম্মেলনে নাস্তিকদের বিপক্ষে শেখ হাসিনার ওই মন্তব্যটা শুনে আমেরিকাপন্থি শাহবাগীরা ব্যাপক ক্ষেপে যায়। তাদের এই ক্ষোভ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে–যখন আওয়ামী লীগের সাথে চীনের সম্পর্ক মোটামুটি ভালোই ঘনিষ্ঠ হয়। তারা আওয়ামী লীগের ওপর ক্ষেপেছে–কারণ তাদের প্রভু আমেরিকা আওয়ামী লীগের ওপর ক্ষেপেছে।

ইসলামপন্থিদের জন্য আমেরিকাপন্থি বামদের (২.খ) কান্নাটা যে কুমিরের কান্না, সেটার একটা প্রমাণ দিই। আলজাজিরা যখন 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স মেন' ডকুমেন্টারি বানিয়ে শেখ হাসিনা ও সেনাবাহিনীকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইল, র‍্যাব কর্তৃক বিচারবহির্ভূত গুম ও ক্রসফায়ারের বিষয়টা নিয়ে আমেরিকা যখন র‍্যাবের সাত কর্মকর্তাকে নিষেধাজ্ঞা দিলো (বস্তুত মানবাধিকার লঙ্ঘনের এসব দায় আওয়ামী লীগের ওপরেই বর্তায়), তখন আমেরিকাপন্থি বামরা (উভয়পক্ষ) ব্যাপক আনন্দে হইহুল্লোড় করা শুরু করল। এমন একটা ভাব করল, যেন আমেরিকা বিশ্বের রাজা; আর বাকি সব রাষ্ট্র হলো আমেরিকার প্রজা। রাজা এবার তার এক প্রজাকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে চাচ্ছে।

অথচ আমেরিকাপন্থি এই বামদের ভেতরে যদি ন্যূনতম নৈতিকতাবোধ থাকত, তারা যদি সত্যিই মানবাধিকার রক্ষার পক্ষের কেউ হতো, তাহলে তারা সর্বপ্রথম আমেরিকাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাত। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, আফগানিস্তানে লাখ লাখ মুসলমান হত্যাকারী আমেরিকা নিজেই তো সবচেয়ে বড়ো মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী। অগণিত মুসলমান নারী, শিশু, বৃদ্ধকে নির্বিচারে বিমান হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে। এসব গণহত্যার চাক্ষুষ প্রমাণ তো আজ বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত। দিনের আলোর মতো সব পরিষ্কার। তো, একই অপরাধে অপরাধী আমেরিকা কীভাবে নিজের বিচার না করে অন্যের বিচার করতে আসে? কোন সাহসে অন্যের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে প্রশ্ন করতে আসে?

মুসলিম দেশগুলোতে আমেরিকা কর্তৃক গণহত্যার কিছু জরিপ দেখুন।

★ ইরাক :

১. Lancet Survey-এর জরিপ অনুযায়ী ২০০৩-২০০৬ পর্যন্ত নিহত হয়েছে **৬ লাখ ১ হাজার ২৭** জন।

২. 'PLOS Medicine' নামের একটি সাপ্তাহিক মেডিকেল জার্নালের জরিপ অনুযায়ী ২০০৩-২০১১ পর্যন্ত **৪ লাখ ৬০ হাজার** জন নিহত হয়েছে।

৩. বৃটিশ সংস্থা Opinion Research Business-এর ২০০৭ সালের জরিপ অনুযায়ী নিহত হয়েছে **১০ লাখ ৩৩ হাজার**।

৪. উইকিলিক্স Classified Iraq War Logs নামে ২০১০ সালে মার্কিন সেনাদের অফিসিয়াল যেসব নথি ফাঁস হয়, সে নথি অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা **১ লাখ ৯ হাজার ৩২** জন।

৫. Iraq Body Count Project **২ লাখ ৫ হাজার ৭ শত ৮৫** জনের মৃতদেহ খুঁজে পায়।

★ আফগানিস্তান :

১. Cost of War Project জরিপ অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা **৩ লাখ ৬০ হাজার**।

২. জাতিসংঘের জরিপ অনুযায়ী ২০১৮ সালে নিহত হয়েছে **১০৯৯৩** জন।

★ সিরিয়া :

১. Syrian Observatory of Human Rights-এর জরিপ মতে, ২০১১-২০১৯ সাল পর্যন্ত নিহত হয়েছে **৫ লাখ ৭০ হাজার**।

২. UN and Arab League-এর জরিপে ২০১১-২০১৬ সাল পর্যন্ত নিহত হয়েছে **৪ লাখ**।

(নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই ভালো জানেন।)

ফিলিস্তিনে মুসলিম হত্যা তো দৈনন্দিন ব্যাপার। এই তো কিছুদিন আগে ইজরাইল গাজায় বিমান হামলা করে প্রায় ৩০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ছিল ৬০ জনের অধিক। অবৈধ রাষ্ট্র ইজরাইল বছরের পর বছর ধরে কী করছে? কার সাহসে করছে? এসব কিন্তু বিশ্বের মানুষ জানে। ইজরাইল দিনের পর দিন নিরীহ ফিলিস্তিনি মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। আর আমেরিকা প্রকাশ্যে ইজরাইলকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ছি! কী লজ্জা! কী ভণ্ডামি!

ইউরোপের কথা না হয় বাদই দিলাম। এক আমেরিকার এত কুকর্ম দেখার পর কোথায় থাকে ইউএন, ইউনিসেফ, হিউম্যান রায়টস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, সেভ দ্য চিলড্রেন, 'বিবিসি', 'সিএনএন', 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'গার্ডিয়ান', 'রয়টার্স', 'আল-জাজিরা'? তখন 'আল-জাজিরা'-কে 'অল দ্য আমেরিকাস মেন' নামে কোনো ডকুমেন্টারি করতে দেখি না। এক কলিন পাওয়েলের ওপর সব দোষ চাপিয়ে আমেরিকাকে দুধে ধোয়া তুলসীপাতা বানানো হয়। এসব আন্তর্জাতিক এনজিও এবং গণমাধ্যমগুলো যে আমেরিকার পোষা কুকুর, এটা সাধারণ মানুষ এখন বোঝে। বাংলাদেশের বিটিভি চ্যানেল আছে একটা। আর আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যের বিটিভি চ্যানেল আছে একাধিক। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটা করে বিটিভি চ্যানেল থাকে। যারা উক্ত রাষ্ট্রের মিডিয়া রেজিমেন্টের ভূমিকা পালন করে। পালা-পোষা কিছু মানবাধিকার সংস্থা থাকে। কিছু বুদ্ধিজীবীও (পড়ুন পরজীবী) থাকে।

বাটপার আমেরিকার আরও একটা বাটপারি হলো—মধ্যপ্রাচ্যে লাখ লাখ মুসলমানকে হত্যা করে চীনের উইঘুরের মুসলিমদের নিয়ে মায়াকান্না শুরু করেছে বছর পাঁচেক যাবৎ। অথচ ওই একই অঞ্চলের সীমান্তের এপারে কাশ্মীরিদের মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিন্দুত্ববাদীদের ব্যাপারে আমেরিকা ও ইউরোপ একেবারে চুপ। ওরা মুসলমানদের অভিভাবক নয়। না বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিভাবক। ওরা মুসলমানদের ব্যাপারে আওয়াজ তুললেই কী আর না তুললেই কী।

মুসলমানরা এসব পরোয়া করে না। মুসলমানদের সাথে তাদের মহিমান্বিত রব আছেন। তবুও এগুলো বললাম এজন্য যে, বিশ্বের অভিভাবক হওয়ার ভাব ধরে ওরা দ্বিমুখী আচরণ করছে। নীরব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

গুরু যেমন বাটপার, শিষ্যগুলোও তেমন বাটপার। একটা প্রমাণ দেখুন। সাংবাদিক কনক সারওয়ার ও ড. তাজ হাশমি মিলে ২০২২ সালে আফগানিস্তানে আমেরিকার ড্রোন হামলার কারণে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে টকশোর একটা জায়গায় বলল, 'আরব দেশগুলোতে গণতন্ত্র নেই, রাজতন্ত্র চলছে। গাল্ফ স্টেটগুলো সব ইসলাম ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত।'

তো, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে কি গণতন্ত্র আছে? যদি থেকে থাকে, তাহলে ইংল্যান্ডে কুইন তথা রাজপরিবার থাকে কী করে? সেখানে হাউস অব কমন থাকা সত্ত্বেও হাউস অব লর্ডস আছে কেন? একইভাবে, আমেরিকাতে কংগ্রেস থাকা সত্ত্বেও সিনেট আছে কেন? একচোখা দাজ্জালের মতো এগুলো নিয়ে তারা বলবে না। অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, শিক্ষিত দালালরা এসব বাটপারি না বুঝলেও অথবা বোঝা সত্ত্বেও প্রকাশ না করে চুপ থাকলেও, সত্যসন্ধানী মানুষ এখন এসব ভালোমতোই জানে।

–// সেদিনের ওই টকশোতে তাজ হাশমি আরও বলল, '২০২১ সালে তালেবানরা ক্ষমতা নেওয়ার পরপর অনেক আফগান নাগরিক তালেবানদের ভয়ে এবং আমেরিকার প্রতি আস্থা রেখে আমেরিকার পাঠানো প্লেনে করে যেভাবে পেরেছে আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়ে গেছে। (মানে পালানো লোকগুলো ভালো।)

পরাজিত শক্তির পক্ষে কাজ করা বিশ্বাসঘাতকরা নতুন ক্ষমতাসীনদের হাত থেকে পালাতে চাইবে–এটাই তো স্বাভাবিক।

যাহোক, তালেবানরা যেদিন ক্ষমতা গ্রহণ করে, এই কনক-হাশমিরাই কিন্তু সেদিন অন্য একটা টকশোতে এই একই দৃশ্য দেখিয়ে বলেছিল–আওয়ামী লীগের চেলাপেলারা একসময় বাংলাদেশ ছেড়ে এভাবে পালাবে। (মানে পালানো লোকগুলো খারাপ।)

কতটা ধূর্ত! একই ঘটনা নিজেদের সুবিধামতো দুই টকশোতে দুই রকম করে ব্যবহার করল।

—// অপশক্তির বিরুদ্ধে তালেবানরা অস্ত্র ধরেছে; এটাকে তারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলল। আমেরিকা 'সন্ত্রাসী' হত্যা করে পৃথিবীর উপকার করছে, সেই পক্ষে ওকালতি করল।

এই তারাই কিন্তু কিছুদিন আগে হেফাজতে ইসলামকে উসকানি দিয়েছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রে এটাই জিহাদ) করতে। এদের কথামতো হেফাজত এ রকমটা করলে তখন কিন্তু সেটা সন্ত্রাসী কার্যক্রম হতো না। কারণ, এতে করে প্রভু আমেরিকার স্বার্থ হাসিল হতো। তখন আমেরিকা নিজেদের পছন্দমতো বাংলাদেশে পাপেট শাসক বসাতে পারত, যেন চীনকে মোকাবিলা করা সহজ হয়।

—// আমেরিকা যে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে স্বাধীন একটা দেশের ভেতরে ড্রোন হামলা চালিয়ে আন্তর্জাতিক আইন পরিপন্থি কাজ করল, সেই ব্যাপারটা তারা দুজন কৌশলে চেপে গেল।

আসলে রুটির পয়সার জন্য ভৃত্য কনক-হাশমিরা তাদের মনিবদের অপকর্মকে গ্লোরিফাই করবে—এটাই স্বাভাবিক। কনক তার সেদিনের কাজ দিয়ে এটাই প্রমাণ করেছে যে, পশ্চিমা হোক আর বাঙালি হোক, সাংবাদিক গোষ্ঠীটাই আসলে বিশেষ একটা প্রাণীর মতো ভীষণ প্রভুভক্ত।

আওয়ামী লীগের পক্ষে সাফাই গাচ্ছি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বড়ো চোর আমেরিকা কোন নৈতিক অধিকারে ছোটো চোর আওয়ামী লীগের বিচার করতে আসে? আর এই বড়ো চোরদের অনুসারী শাহবাগীরাই-বা আবার কোন মুখে বড়ো চোরের পক্ষ নিয়ে উঁচু গলায় কথা বলে?

প্রশ্ন আসতে পারে—আপনারা কি এতই বোকা যে, নিজেদেরই শত্রুর লাঠি হয়ে তার শত্রু সাপটাকে (আপনাদেরও শত্রু) ঝুঁকি নিয়ে মারবেন, ফায়দাও লুটে নেবে সব উভয় শত্রুপক্ষের যেকোনো একপক্ষ, আর আপনারা সেসব কূটচালের কিছুই বুঝবেন না? না, আসলে আপনারা এতটা বোকা নন। আসলে আপনাদেরকে

ধোঁকা দেওয়া হবে। ধোঁকাবাজ আপনাদের দলেরই লোকজন; যাদেরকে আপনারা মেনে চলেন, সমীহ করেন, পথপ্রদর্শক মনে করেন।

আওয়ামী লীগ এবং আমেরিকান ব্লক ভালোমতোই জানে, আপনারা ওদের কথায় ওদের হয়ে লড়াইয়ে নামবেন না। তাই ধোঁকাবাজদের ওই বড়ো দুই শত্রুপক্ষ যে যেভাবে পারবে আগে আগে কিনে নেবে। ধোঁকাবাজদের এই দলে থাকবে ইসলামিক বক্তা, ইসলামিক লেখক, লম্বা দাড়ি ও জোব্বাওয়লা ভণ্ড আলেম। কোন সব বক্তা? কোন সব আলেম? কোন সব লেখক? অচেনা কেউ? উঁহু। এরা সেসব বক্তা, যাদের কথা আপনারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনেন। এরা সেসব আলেম, যাদেরকে আপনারা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেন। এরা সেসব লেখক, যাদের লেখা আপনারা গোগ্রাসে গিলে খান। তারা হবে জনপ্রিয়। লোকেরা তাদের চিনবে। তাদের অনেক অনুসারী থাকবে। অচেনা কাউকে দিয়ে কী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? যায় না। তারা পকেটে আওয়ামী লীগ অথবা আমেরিকাকে নিয়ে আপনাদেরকে ইসলামের গল্প শোনাবে। যেই মাথাটা যেই পন্থিদের কাছে বিকিয়েছে, কোনো সংকট তৈরি হলে সেই মাথাটা সেই পন্থিদের পক্ষ হয়ে এমন এমন ইসলামি ব্যাখ্যা দেবে, যেটাতে নিজ খরিদদারকে নির্দোষ প্রমাণের একটা অপচেষ্টা থাকবে। তারা ইসলামের জিহাদ-কিতালের মতো কঠিন হক কথা বলবে, তবে নিজ খরিদদারের জন্য একটা সেইফ এক্সিট রেখে দেবে; যেন আপনারা জিহাদ করে দুনিয়া তছনছ করে ফেললেও উক্ত খরিদদারকে কিছু না বলেন। তারা আপনাকে একচোখা দাজ্জালের মতো নিজ খরিদদারকে পকেটে লুকিয়ে রেখে অন্য খরিদদারকে দেখিয়ে বলবে—ওই যে ওইটা হলো তাগুত-কাফের।

(আমার সন্দেহের তালিকায় কতিপয় ধোঁকাবাজ আছে। সময় ও সম্ভব হলে একদিন নামগুলো বলব। অবশ্য চোখ-কান খোলা রাখলে আপনারাও আজকের পর থেকে চিনে ফেলবেন এদের।)

জনপ্রিয় এসব ধোঁকাবাজ ছাড়া আপনাদেরকে বাগে নেওয়া সম্ভব না। কারণ, শত্রুকে আপনারা ভালোমতোই চেনেন। দু-পক্ষই আপনাদেরকে আঘাত করেছে, করছে। দু-পক্ষের হাতেই আপনাদের শরীরের রক্ত লেগে আছে।

কিন্তু আপনারা তো নিজেদের মতাদর্শ ছাড়া রক্ত দেবেন না। তাহলে আপনাদের বাগে নিয়ে ওরা কাজে লাগাবে কীভাবে? খুব সহজ। ওই যে ধোঁকাবাজরা আছে না? আপনারা জানবেন ওটা খাসির গোশত খাচ্ছেন। অথচ গত রাতের

গোলটেবিল বৈঠকে জবাই হয়েছিল আস্ত একটা কুকুর! ওরা আপনাকে জিহাদের কথা বলে মাঠে নামাবে। প্রাণ দেওয়াবে। আপনারা তো ভাববেন, আপনারা জিহাদ করছেন নির্দিষ্ট কোনো 'আমিরের' নির্দেশনামতো। কিন্তু বাস্তবতা হলো–সেই তথাকথিত আমির হয় আওয়ামী লীগ নতুবা আমেরিকান ব্লকের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।

বন্দির পাঁঠা

সবচেয়ে ভয়ংকর যে কাজটা করা হচ্ছে, তা হলো–ভারত ও ভারতের সাধারণ হিন্দু জনগণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে থাকা ইসলামবিদ্বেষকে এক মোদি, বিজেপি ও আরএসএস-এর ওপর চাপিয়ে দিয়ে ভারত নামক বিষটাকে নকল মধু বানিয়ে মুসলিমদের গেলানোর চেষ্টা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী ফুট সোলজারদের চেনার উপায় হলো–এরা মুসলিম নিধনের জন্য বিজেপি ও আরএসএসকে গালি দেবে। কিন্তু ভারত ও ভারতের উগ্র হিন্দু জনগণকে নিষ্পাপ শিশু বলে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। ওরা বলবে–ভারত ও ভারতের সাধারণ হিন্দু জনগণ আপনার শত্রু না। আপনার শত্রু মোদি, বিজেপি, আরএসএস। অথচ, যাহা বিজেপি ও আরএসএস, তাহাই ভারত ও ভারতের হিন্দু জনগণ।

এসব করার পেছনে কারণ হলো, ভারত চরমপন্থি হিন্দু রাষ্ট্র হওয়ায় খুব বেশি একটা সুবিধা করে উঠতে পারছে না আওয়ামী লীগের সাথে। আগেই বলেছি, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তথা বাঙালি মুসলমান ভারতের ইসলামবিরোধী কাজ ও নিরীহ মুসলমান হত্যার জন্য ভারতকে ঘৃণা করে। তাই ভারত আওয়ামী লীগকে খেয়ে দিলেও বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবে না; বরং ওর জন্য এটা লোকসানের কারণ হবে। আওয়ামী লীগ ভারতকে উজার করে যে সকল সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে, শেষমেশ সেটাও হারাতে হবে। এজন্যই ভারত চাইলেও এখন আওয়ামী লীগকে খেয়ে দিতে পারছে না। ফলে আমেরিকার উপমহাদেশীয় আঞ্চলিক অ্যালাই হিসেবে ভারত বাংলাদেশের মাটিতে কেওয়াজ সৃষ্টি করার দিকে অগ্রসর হতে না পারলে আমেরিকা ও ইউরোপও এদিকে বিড়ালের মতো মাথাটা ঢুকিয়ে দিতে পারছে না। ফলে মিলিটারি বেইজ বানিয়ে চীনকে মোকাবিলার ওদের দীর্ঘ পরিকল্পনাও একপ্রকার অচলাবস্থায় পড়ে গেছে।

এখানে মজার একটা বিষয় কী ঘটেছে জানেন? ভারত ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ওর আচরণের কারণে একটা বিশাল অপারচুনিটি মিস করেছে। যেই বাংলাদেশকে ভারত খুব সহজেই নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারত, সেই ভারত আজকে বাংলাদেশে একটা ঘৃণ্য নাম। কেন?

বলছি শুনুন। ক্রিকেট খেলা দিয়েই একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলাদেশের নাগরিক এমন একজন হিন্দুও পাবেন না, যে কি না পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে সমর্থন করে। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক এমন অনেক মুসলমান আছে, যারা কি না ভারতের ক্রিকেট দলকে মনঃপ্রাণ দিয়ে সমর্থন করে। আমি নিজেও একসময় সমর্থন করতাম। বাংলাদেশে বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রভাব কতটা, সেটার কথা আজ না হয় থাক। বাঙালি মুসলমান দল বেঁধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূজায় অংশগ্রহণ করে। হলি খেলতে যায়। (তবে সংখ্যাটা এখন অনেক কমে গিয়েছে।)। অন্যান্য এলাকার মুসলিম কিশোর-তরুণদের কথা জানি না। পুরান ঢাকার মুসলিম কিশোর-তরুণদের মানসিকতা এমনই সেক্যুলার ধরনের। আমি নিজেও একেবারে কিশোর বয়স থেকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে রাতভর পূজার মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে মূর্তি দেখতাম। পূজার লাড্ডু খেতাম। পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসলে সেখানে যেতাম। (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে ক্ষমা করুন।)

আমার নিজের দু-একটা ঘটনা বলি। পুরান ঢাকায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাই হিন্দু সংস্কৃতি অনেক কাছ থেকে দেখেছি। এখানে হিন্দুদের সংখ্যা অনেক। মন্দিরও অনেক। পূজার সময় এলাকার গলিতে গলিতে মণ্ডপ বসে। শাঁখারি বাজার নামে একটা এলাকা আছে। এটা শতভাগ হিন্দুদের এলাকা। এই একটা এলাকায় সরু গলির ভেতরে ২০ ফিট দূরে দূরে মণ্ডপ বসে। এখানকার পরিবেশটা একেবারে ভিন্ন আকার ধারণ করে পূজার সময়। সবচেয়ে জমকালো আয়োজন হয় এই এলাকায়। মুসলমান বন্ধুরা মিলে দল বেঁধে এই এলাকায় পূজা দেখতে যেতাম। সূত্রাপুর, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকেশ্বরী, এসব জায়গা চষে বেড়াতাম। বেশ আনন্দ পেতাম। পুরান ঢাকার রাস্তায় কুরবানির পশুর হাট বসলে গরু-ছাগল-উট দেখতে যেতাম যে রকম আনন্দ নিয়ে, পূজার সময় মূর্তি দেখতে যেতাম সে রকম আনন্দ নিয়ে। মানে 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' বিষয়টা এমনিতেই মনের ভেতরে গেঁথে ছিল। পুরান ঢাকার অধিকাংশ মুসলিম ছেলেরা এমন মানসিকতারই ছিল। শাকরাইন নামে হিন্দুদের একটা পূজার দিন আছে। এই দিন ঘুড়ি উড়াতাম। শাকরাইনের আয়োজনটা আমরা বন্ধুরা নিজেরাই করতাম। আমাদের এক বন্ধুর বাড়ির ছাদে। নিজেরা চাঁদা তুলে সাউন্ড সিস্টেম, লাইটিং ভাড়া করতাম। ঘুড়ি কেনা, সুতায় রঙিন মাঞ্জা দেওয়া, আতশবাজি কেনা–সে কী আয়োজন! দুই মাস আগে থেকে এই পরিকল্পনা চলত। শাকরাইনের দিন সকাল থেকে পুরান ঢাকার প্রতিটি ছাদে–বিশেষ করে সূত্রাপুর, লক্ষ্মীবাজার, নারিন্দা, গেন্ডারিয়া এলাকায় এই

আয়োজন চলে। একদম রাত পর্যন্ত চলে। সারাদিন গান বাজে। ঘুড়ি ওড়ায়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন থাকে। সন্ধ্যায় আতশবাজি ফোটানো হয়। আয়োজকদের ৯০% মুসলিম কিশোর ও তরুণ। অবাক করা বিষয় হলো, আমরা মুসলিম বন্ধুরা আয়োজন করে হিন্দু বন্ধুদের দাওয়াত দিতাম। হিন্দু বন্ধুরা কোনো আয়োজন করত না। অথচ পূজাটা ওদের! আমাদের আয়োজনে অল্প পরিমাণ চাঁদা দিয়ে অংশগ্রহণ করত ওরা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অশেষ রহমতে অনেক আগে এসব বাদ দিয়ে জাহান্নামের এই টুকরা থেকে নিজেকে তুলে এনেছি। (গাফুরুর রহিম, আমাকে ক্ষমা ভিক্ষা দিন!)

তো, এমন একটা স্যেকুলার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কপাল পোড়া ভারত আয়ত্তে নিতে পারল না। কপাল পোড়া বললেও আসলে কম হয়ে যায়। আঞ্চলিক ভাষায় বলা উচিত পিছা (ঝাড়ু) কপাইলা। একটু মিষ্টি কথার মাধ্যমে চাইলেই যারা নিজের লুঙ্গি খুলে ভারতের ঘরের বেড়ার ফুটা ঢেকে দেওয়ার মতো মানসিকতা রাখত। তারা আজ ভারতের যেকোনো দুঃখে তৃতীয় ঈদের আনন্দ পায়। কথায় কথায় ভারতের নিকুচি করতে চায়। এটা ভারতের চরম একটা ব্যর্থতা।

দেরি করে হলেও ভারত সেটা বুঝতে পেরেছে। এমন একটা সুযোগ নিজের দোষে হাতছাড়া হওয়ায় ভারতের এখন আফসোসের শেষ নেই। এজন্যই দেখবেন, ভারতপন্থি চিকন বুদ্ধিওয়ালা বামেরা (পড়ুন ছুপা হিন্দু) বাংলাদেশের মুসলমানদের পেছনে তেলের বদলে খাঁটি ঘি মাখা শুরু করেছে। এমনকি গোপন মিটিংয়ে অখণ্ড ভারত দাবি করা গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিকের মতো উগ্রবাদী হিন্দু নেতাও পহেলা বৈশাখের বিপক্ষে কথা বলে মুসলমানদের পক্ষ নেয়।

বস্তুত ওরা চায় মডারেট মুসলমানদের চোখে ভালো সাজতে। কারণ, বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই মডারেট মুসলিম। ওদের উদ্দেশ্য হলো, ওরা মডারেট মুসলমানদের সমর্থন আদায় করতে না পারুক; অন্তত একটু একটু করে বাংলাদেশকে গিলে খাওয়ার সময় বলিউড, পহেলা বৈশাখ, শাকরাইন, পূজা-হলি, বিয়ে-হলুদে হিন্দু রীতি, পোশাকে-আশাকে হিন্দু সংস্কৃতিতে বুদ হয়ে থাকা মডারেট মুসলমান নামক বিপুল জনগোষ্ঠী যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

তো, যা বলছিলাম। সব দোষ মোদি, বিজেপি ও আরএসএস-এর ওপরে চাপিয়ে ভারত নামক উগ্র ও চরমপন্থি হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের হাতে লেগে থাকা মুসলমানদের রক্ত ধুয়ে ফেলার এক মহাপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কুবুদ্ধি

পশ্চিমাদের। পশ্চিমারা নিজেরাও একই পথে হাঁটছে। মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে মোদি ও বিজেপিকে বলি দেওয়া হবে। এরপর ক্ষমতায় আনা হবে কংগ্রেসকে। কংগ্রেস গরু খেতে বাধা দেবে না। জোরপূর্বক 'জয় শ্রী রাম' বলতে বলবে না। মসজিদে আগুন দেবে না। সেক্যুলার সেক্যুলার একটা ভাব ধরে থাকবে কংগ্রেস। তাতে কিন্তু চরমপন্থি হিন্দু রাষ্ট্র ভারতের 'অখণ্ড ভারত' পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে না। জু-নগর (১৯৪৭), হায়দ্রাবাদ (১৯৪৮), কাশ্মীর (১৯৫২), গোয়া (১৯৬১), সিকিম (১৯৭৫); '৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় হাতছাড়া হওয়া রাজ্যগুলোর মধ্যে এই পাঁচটি রাজ্য ভারত কর্তৃক পুনর্দখল হয়েছে। যার প্রতিটিই হয়েছিল নেহেরু ও ইন্দিরার হাত ধরে। এই নেহেরু ও ইন্দিরার কংগ্রেস তো বিজেপির মতো ধর্মভিত্তিক কোনো দল ছিল না। তথাকথিত সেক্যুলার (পড়ুন ছুপা হিন্দু) দল ছিল। ওরা কীভাবে এমন কাজ করল?

বলবেন–ওদের ফরেইন পলিসি একই। তাই ক্ষমতায় যে-ই আসুক, ওরা দেশের স্বার্থ আগে রাখে। তাহলে আমি বলব, একটা দেশের স্বার্থ মানে–দেশের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ। অর্থাৎ, দেশটা কোন পথে হেঁটে কী অর্জন করতে চায়। এখন ওদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যদি হয় অখণ্ড ভারত, তাহলে তো সেটা সনাতন ধর্মাদর্শের সাথে মিলে গেল। তাহলে ফলাফল দাঁড়াল–গোটা দেশটাই চলছে সনাতনী মতাদর্শ অনুসরণ করে।

দশ কথার এককথা হলো : মুসলমানের সন্তান সেক্যুলার হলে মন থেকেই হয়। ভেতরে কোনো লুকোচুরি থাকে না। কথার হেরফের হয় না। ইসলামকে কড়াকড়িভাবে বর্জন করে। কারণ, গায়ের রক্ত তো মুসলমানের। আর হিন্দুর সন্তান সেক্যুলার হলে হয় স্রেফ মুখের কথায়। ভেতরে থাকে হিন্দুপ্রীতি, হিন্দুত্ববাদ, ইসলামবিদ্বেষ। কারণ, গায়ের রক্ত তো হিন্দুর। '৪৭-এর দেশ ভাগে এই কারণেই প্রকৃত সেক্যুলার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, 'মৌলানা' আবুল কালাম আজাদরা অপ্রকৃত সেক্যুলার ওরফে ছুপা হিন্দু জহর লাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, ভাল্লাভাই প্যাটেলদের কাছে 'আগামীর ভারতের নীতিমালা'র বিষয়ে পলটি খেয়েছিল। এজন্যই একটা কথা অন্তরে গেঁথে রাখবেন–হিন্দু বংশোদ্ভূতরা কস্মিনকালেও সেক্যুলার হয় না।

তবে পশ্চিমারা এই পরিকল্পনায় খুব বেশি একটা সুবিধা করতে পারবে না। কারণ, হিন্দু পুরুষরা মদ ও নর্তকীতে আসক্ত। অবিবেচক ও মোটা বুদ্ধিসম্পন্ন। বিজেপি হিন্দু যুবকদের হিন্দুত্ববাদের টনিক সেবন করিয়ে উন্মত্ততায় মাতিয়ে যেভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে, এইখান থেকে পিছু হটলে খোদ হিন্দুরাই বিজেপিকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে; উদারবাদীতার আলখাল্লা গায়ে দেওয়া কংগ্রেসকে উগ্রবাদী হিন্দু সম্প্রদায় গ্রহণ তো করবেই না। হয় কংগ্রেস নামক আরেক হিন্দুত্ববাদী দলের সূক্ষ্ম কৌশল সাধারণ উগ্রবাদী হিন্দুরা বোঝে না, অথবা সূক্ষ্ম কৌশল বোঝে ঠিকই, তবে গরু খেতে দিয়ে মুসলিমদের প্রতি ওরা একবিন্দুও উদারতা দেখাবে না; মুসলিমদের প্রতি সাধারণ উগ্রবাদী হিন্দুরা জিরো টলারেন্স।

বলি হওয়ার বিষয়টা বিজেপি টের পেয়েছে। টের পেয়েই মোদি একটু নরম সুরে কথা বলছে। কাশ্মীরের স্ট্যাটাস ফিরিয়ে দেবে বলেছে। কিন্তু 'দ্য মুতখোরস্' কখনো স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে না। আর ভারতের মোট হিন্দু জনসংখ্যাকে বিবেচনায় নিলে এই মুতখোরসদের পাল্লাটাই ভারী। ভারতে এখন উগ্র হিন্দুত্ববাদের জোয়ার চলছে।

ভারতের হাতে বাংলাদেশ দখল করার রাস্তা একটাই। তা হলো, মুসলিম-হিন্দু দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দু রক্ষার নামে বাংলাদেশে ভারতের সেনাবাহিনী দিয়ে আক্রমণ করানো। এজন্যই দেখবেন,

★ মূর্তির পায়ে পবিত্র কুরআনুল কারিম রাখা হয়।

★ প্রিয়া সাহা ট্রাম্পের কাছে গিয়ে বিচার দেয়।

★ হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকারা হিজাব নিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্য করে।

★ তথাকথিত বিজ্ঞানের শিক্ষক হৃদয় মন্ডল ক্লাসে নাস্তিকতা প্রচার করে।

★ ঝুমন দাসের মতো কতিপয় হিন্দুরা ইসলামবিরোধী বক্তব্য দেয়।

★ হিন্দুরা রাসূল (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি করে।

★ নিজের ঘরে নিজেরা আগুন দেয়।

অর্থাৎ, ভারত বাংলাদেশের হিন্দুদেরকে বাংলাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছে। এমন এমন কাজ করাচ্ছে, যেগুলো দেখে মুসলিমরা প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য হচ্ছে।

আর এসবই হচ্ছে বাংলাদেশে হিন্দুদের মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে। পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে 'র' ও ইসকন। বিগত ৫-৭ বছরে এরা অগণিত হিন্দু কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতিকে মন্দিরে ডেকে নিয়ে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখিয়ে হিন্দুত্ববাদী চেতনায় উজ্জীবিত করে বাংলাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। মগজধোলাইকৃত এসব হিন্দুদের হাতের কবজিতে দেখবেন লাল সুতা বাঁধা। একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন—হয়তো কয়েক বছর আগেও আপনার পরিচিত হিন্দু ব্যক্তিটি আপনার সাথে স্বাভাবিকভাবে কুশল বিনিময় করত। কিন্তু হাতে লাল সুতা বাঁধার পর আচারণে বেশ পরিবর্তন এসেছে। একটু রাগান্বিত মেজাজ। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে চোখে একটা তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ দেখা যায়। বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা এমন যে, তোমাদের মুসলমানদের সাথে বহু দিনের পুরোনো একটা হিসাব চুকানোর সময় এসেছে। এগুলো সবই পুরোনো কথা। এসব নিয়ে এ পর্যন্ত অনেকে লেখালেখি করেছে। অনেকে অনেক ডকুমেন্টারি তৈরি হয়েছে। এগুলো এখন প্রকাশ্য। তাই পুরোনো বিষয় নিয়ে বেশি কিছু বলব না।

তবে নিজের তিনটা অভিজ্ঞতার কথা বলি।

★ অনার্সে পড়াকালীন প্রতি ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষায় রোল নাম্বার অনুযায়ী আমার সামনে একটা হিন্দু ক্লাসমেট বসত। পুরো চারটা বছরই ঘাড় ঘুরিয়ে আমার খাতা কপি করে পাশ করেছে। আমিও নিঃসংকোচেই দেখাতাম। মাস্টার্সে রোল পরিবর্তন হয়ে যায়। নাহলে তখনও দেখত। আমিও যে হেল্প নিইনি, তা না। হয়তো ১০ মার্কের উত্তর দেখেছি, বিনিময়ে ৯০ মার্ক দেখিয়েছি। ওই ১০ মার্ক সে সংগ্রহ করত সামনের জনের থেকে। যাহোক, সম্পর্ক স্বাভাবিকই ছিল। যেহেতু পাশের এলাকাতে থাকত, তাই রাস্তায় দেখা হলে হাসিমুখে হায়-হ্যালো চলত। একসময় খেয়াল করলাম, রাস্তায় দেখা হলে এড়িয়ে যায়। পরিবর্তনটা একেবারে হঠাৎ এবং খুব দ্রুত হয়েছে। এভাবে বেশ কিছুদিন এমন আচরণ দেখার পর আবিষ্কার করলাম, ওর ডান হাতের কবজিতে লাল সুতা বাঁধা। বুঝলাম কাহিনি গড়বড়।

★ ঢাকা শহরে মাঠের অভাব। এলাকার আশেপাশে যে কয়টা বড়ো উঠানওয়ালা বাড়ি ছিল, কিশোর বয়সে এলাকার সমবয়সি ছেলেরা মিলে সেই বাড়িগুলোতে খেলতাম। বাড়ির মালিকরাও নিঃসংকোচে খেলতে দিত। কখনো গলিতে গলিতে খেলতাম। হরতাল হলে মেইন রাস্তায় খেলতাম। ছোটোবেলা এভাবেই কেটেছে। পুরান ঢাকায় হিন্দুদের বসবাস বেশি। বিশেষ করে আমাদের এলাকা এবং আশেপাশের ৮/১০টা এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবেই ছোটোবেলার খেলার সঙ্গী হিসেবে ২/৪ জন হিন্দু বন্ধু থাকতই। বড়ো হওয়ার পরও রাস্তায় হাঁটতে-চলতে ওদের সাথে কথা হতো। হঠাৎ দেখি ওরা এড়িয়ে যায়। আবিষ্কার করলাম, হাতের কবজিতে লাল সুতা বাঁধা। বুঝলাম কাহিনি গড়বড়।

★ আম্মুর জন্য এলাকার নির্দিষ্ট একটা ফার্মেসি থেকে ব্লাড প্রেশারের ওষুধ কিনতাম। ফার্মেসির মালিক হিন্দু, বয়সে আমার ২/৩ বছরের বড়ো হলেও, দেখা হলে খুব সম্মানজনক আচরণ করত। কুশল বিনিময় করত। রাস্তায় দেখা হলেও হাসি হাসি মুখে হায়-হ্যালো। হঠাৎ হায়-হ্যালো বন্ধ। আবিষ্কার করলাম, হাতের কবজিতে লাল সুতা বাঁধা। বুঝলাম কাহিনি গড়বড়।

এ রকম ঘটনা আরও বলতে পারব। ওদের সবার আচরণগত এই পরিবর্তনটা একই সময়সীমার মধ্যে হয়েছে এবং একেবারে হঠাৎ। কথা হলো, এই মানুষগুলো কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই আমাকে এড়িয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, হয়তো-বা তার ধর্মের প্রতি সে অনুরাগী হয়েছে আর আমার ধর্মের প্রতি আমি অনুরাগী হয়েছি। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষের সাথে তো কোনো দ্বন্দ্ব হয়নি। লাল সুতাওয়ালাদের উদ্দেশ্য কী, আমি যে সেসব জানতাম না, ব্যাপারটা তা না। ততদিনে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হিদায়াতের মাধ্যমে সবই চিনিয়েছেন আমাকে। তবুও আমি কয়েকবার ওদের দিকে তাকাতাম হায়-হ্যালোর উদ্দেশ্যে; দেখি ওরা কী রকম ফিডব্যাক দেয়। দেখলাম, নো রেসপন্স। অর্থাৎ, ওরা আমাকে আগে থেকেই ওদের শত্রু ভেবে বসে আছে।

যাদের হাতে লাল সুতা নেই, তারা আগের মতোই স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশের হিন্দুদের কাছে ভারতই যেহেতু পবিত্র ভূমি, তাই তারা ভারতকেই তাদের প্রকৃত নিবাস মনে করে। সত্যি কথা বলতে, বাংলাদেশের ৯৫% হিন্দু অখণ্ড ভারত চায়। যেসব হিন্দু নিজেদের বাম নাস্তিক দাবি করে, ওরাও এটাই চায়। তাই আমি হিন্দু

বংশোদ্ভূত বাম নাস্তিকদের 'ছুপা রাম' বলি। একবার এক ছুপা রাম বলেছিল, 'ভারত আছে বলেই তো আমরা বাংলাদেশে একটু ভালো আছি।'

আমি আসলে এতে দোষের কিছু দেখি না। যে যেই মতাদর্শের, সে সেই মতাদর্শের উৎপত্তিস্থলের সাথে নিজের ভূখণ্ডকে জুড়তে চাইবেই। আর এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ মক্কা-মদিনার পাশে হলে আমারও একই ইচ্ছে জাগত। স্রেফ মক্কা-মদিনা বা সৌদি আরব না, রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের সীমানা থাকলে কমিউনিস্টরাও বাংলাদেশকে রাশিয়ার সাথে যুক্ত করতে চাইত। দেখেন না, বাংলাদেশের পশ্চিমাপন্থি সেক্যুলাররা দিনের মধ্যে সত্তরবার আইন্সটাইনের ওয়ার্মহোল ব্যবহার করে পশ্চিমে চলে যায়। শয়নে-স্বপনে সেখানে গিয়ে তারা খায়, গোসল করে, কাপড় বদলায়, হাগু করে, মুতু করে, কুতকুত খেলে (মানে ওদের নীল ছবির স্টাইলে ওগুলা করে আরকি)। ওদের মতো কাঁদে, ওদের ঢঙে মন খারাপ করে।

তো, যেহেতু আমি জাতীয়তাবাদী কোনো সীমানায় বিশ্বাসী নই এবং ইসলাম নামক একমাত্র সত্যকে পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দিগ্‌বিদিক জয় করার মানসিকতা লালন করি, তাই আমার কথা হলো—অখণ্ড ভারত হোক। শুধু অখণ্ড ভারতই-না; অখণ্ড বিশ্ব হোক। যার নেতৃত্ব দেবে মুসলমান। আমি চাই খেলাটা শুরু হোক। মাঠে খেলা চলুক। প্রকৃত ও স্থায়ী ফয়সালা রণাঙ্গন থেকে আসে। ময়দানেই নির্ধারিত হবে—কে কার পিঠে চেপে বসবে। ময়দানেই নির্ধারিত হবে—লাগামটা ওদের হাতে আর আমাদের মুখে থাকবে। নাকি লাগামটা আমাদের হাতে আর ওদের মুখে থাকবে।

তবে ঘটনা যা-ই হোক না কেন, ভারত বাংলাদেশের হিন্দুদের বরশির টোপ বানিয়েছে। ভারত বাংলাদেশের হিন্দুদের বলি দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে একটা কেওয়াজ সৃষ্টি করবে বাংলাদেশটা অখণ্ড ভারতের অংশ বানানোর জন্য। এজন্য যা যা উসকানি দেয়ার সবই ভারত দিয়েছে, দিচ্ছে, দেবে। ভারতের ইশারায় বাংলাদেশের হিন্দুরা উসকানিমূলক যা যা আচরণ করবে, এর ফলে মুসলিমরা যেই প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তার পুরোটাই বাংলাদেশের হিন্দুদের ভোগ করতে হবে।

জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ, আকাশে শকুন

প্রশাসনের পুলিশ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল আওয়ামীপন্থি, আরেক দল ভারতপন্থি। ভারতপন্থিদের প্রায় সবাই-ই হিন্দু। তবে হাতেগোনা কিছু নামধারী মুসলিমও আছে এই দলে। হয় এরা নাস্তিক, নতুবা নারী কেলেঙ্কারি, গুম, খুন, দুর্নীতি ইত্যাদি অপকর্মের প্রমাণ দেখিয়ে তাদের ব্ল্যাকমেইল করে ভারতের পক্ষে কাজ করানো হচ্ছে। একইভাবে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ : মন্ত্রনালয়ের সচিব/অতিরিক্ত সচিব, অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয় কমিশনার, জেলাপ্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারও দু-ভাগে বিভক্ত। একপক্ষ আওয়ামীপন্থি, আরেক পক্ষ আমেরিকাপন্থি। মাঝে মাঝে যে দুর্নীতির নানা চিত্র জনসমক্ষে চলে আসে, এগুলো এদেরই একপক্ষ অন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ফাঁস করে দেয়।

যেকোনো দেশের সেনাবাহিনী তথা সামরিক বাহিনী সেই দেশের জন্য ব্যাকবোন অথবা বুকের খাঁচাস্বরূপ। মানুষের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো বুকের খাঁচায় আটকানো থাকে, যেন বহিরাগত কোনো আঘাত এলেও অঙ্গগুলো সুস্থ থাকে। যদি কোনো কারণে এই অঙ্গগুলো বহিরাগত আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই যায়, তবে প্রথম আঘাতটা আসে বুকের খাঁচার ওপরে।

তো পেছনের এত কথার মাঝে বাংলাদেশের মেরুদণ্ড—অর্থাৎ বাংলাদেশের সেনাবাহিনী কোথায়? চারপাশে এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, তারা কি সেসবের কিছুই টের পায় না? টের অবশ্যই পায়। খেলোয়াড় হিসেবে সেনাবাহিনীও আছে।

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটা কথা বলি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পাক্কা দেশপ্রেমিক এতে একবিন্দুও সন্দেহ থাকা উচিত না। হতেগোনা কিছু গাদ্দার আছে সেনাবাহিনীতে। তবে সামষ্টিকভাবে গোটা সেনাবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে; এটা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যায়। ভারত ও মিয়ানমার প্রশ্নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জিরো টলারেন্স। এমনকি পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনী ও বিজিবি না থাকলে বাঙালিরা ওই জায়গাগুলোতে ভ্রমণে যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারত না; উপজাতি সন্ত্রাসীগুলো এতটাই দুর্ধর্ষ। তবে এটাও সত্য যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মডারেট মুসলিম, গণতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং মানবরচিত সংবিধানের সংরক্ষক। যদিও বিভিন্ন ক্যান্টনম্যান্টের ভবনে এবং সেনাবাহিনীর

অফিসের সম্মুখভাগে বড়ো করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' লেখা, সেনাপ্রধানের অফিসে পবিত্র কুরআনুল কারিমের আয়াতসংবলিত ক্যালিগ্রাফি এবং সূরা লেখা পোট্রেইট, প্রশিক্ষণের সময় পবিত্র কুরআনুল কারিম ছুঁয়ে শপথ ইত্যাদি ইসলামিক ধাঁচ দেখা যায়।

তাই বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে মূলধারার ইসলামের কোনো উপকার আশা করাটা বোকার স্বর্গে বসবাস করার মতো। বরং উলটোটা ঘটবে, ঘটছে, ঘটেছে। যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্য কিছু ইচ্ছে করেন, তো ক্যারিশম্যাটিক কিছু ঘটলে ঘটতে পারে। তবে এর সম্ভাবনা খুব কম। তুরস্কের সামরিক বাহিনী, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী, আফগানিস্তানের সামরিক বাহিনী (সাবেক), বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী–সবার ভিত্তি একই।

যাহোক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও দু-ভাগে বিভক্ত। তিনটা ভাগ ধরা যায়। ধরছি না কারণ–তৃতীয় ভাগটা ঠেকায় পড়ে আওয়ামীপন্থি, বস্তুত চীনপন্থি।

সেনাবাহিনীর ছোটো অংশটা আমেরিকাপন্থি। কর্ণেল শহীদ উদ্দিন খান, লে. জেনারেল হাসান সারওয়ার্দী ইত্যাদি সামরিক কর্মকর্তারা আমেরিকাপন্থি। এই দুজন সামরিক কর্মকর্তা কিন্তু একসময় আওয়ামী লীগের গুড় ঠিকই খেয়েছে। আজকের এই 'আওয়ামী লীগ' গড়ার একসময়কার কারিগর কিন্তু এরাও। এখন পদ ও পয়সার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ক্যাঁচালের কারণে শেষমেশ মাথাটা আমেরিকার কাছে বিকিয়েছে। যেমন : জেনারেল সারওয়ার্দী আশায় ছিলেন যে, তাকে সেনাপ্রধান বানানো হবে; কিন্তু হয়নি।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বড়ো অংশটা এখন চীনপন্থি। সেনাবাহিনীর এই চীনপন্থি অংশটা জানে, আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখন চায় না। চীনপন্থি সেনাবাহিনী চাইলে ক্যু করে ক্ষমতা নিতে পারে। তবুও এই চীনপন্থি সেনাবাহিনীই আওয়ামী লীগকে টিকিয়ে রেখেছে। কেন? ধরুন, সাগরে নৌকা নিয়ে আপনারা কয়েকজন ভাসছেন। হঠাৎ ঝড় শুরু হলো। একটু পরে নৌকার তলায় ফুটো হয়ে গেল। এখন যদি সেখানেই নৌকার তক্তাটা খুলে মেরামত করা শুরু করেন, তাহলে নৌকাটা আরও তাড়াতাড়ি ডুববে। তাহলে বুদ্ধিমানের কাজ হলো, ফুটোটা কোনোভাবে একটু বন্ধ করে নৌকাটাকে নিরাপদে তীরে নিয়ে যাওয়া। এরপর তক্তা বদলে ফেলা। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতি

একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে আসার পর এবং চীন আমেরিকাকে টপকে বিশ্বের মোড়ল হওয়ার পর বাংলাদেশের ফুটা তক্তা বদলানোর কাজ শুরু হবে।

তা ছাড়া বর্তমান বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এমন কোনো ব্যক্তি নেই—যার ক্ষমতা, সাহসিকতা, কৌশল, ফেইস ভ্যালু শেখ হাসিনার সমপর্যায়ের বা শেখ হাসিনার বিকল্প হতে পারে। আপনি মানেন বা না মানেন, এটাই বাস্তবতা। খালেদা জিয়া দুর্বল হয়ে গেছে। এক আছে তারেক জিয়া, যে কি না শেখ হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে। তবে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির যে অবস্থা, তাতে তারেক জিয়াও খুব বেশি একটা সুবিধা করে উঠতে পারবে না। একেবারে ঝানু লোক লাগবে। পাশাপাশি ডু অর ডাই ডিসিশন নিতে পারবে—এমন নেতৃত্ব চাই। মানে হলো—মরলে মরব, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ঠিক রাখার সিদ্ধান্তে অটল থাকব। কারণ, প্রাণের মায়া নিয়ে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে টিকে থাকা যাবে না। পরাশক্তিরা দুর্বল দেশগুলোর প্রধানদের হুমকি-ধমকি দিয়ে হলেও নিজেদের দিকে টানবে।

বাংলাদেশের ব্যাপারে আমেরিকা ও ভারত ওত পেতে আছে। উপরন্তু, বাংলাদেশের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও ততটা সুবিধাজনক না। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার মানে হলো—বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চরম আকার ধারণ করবে। নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যোগ্য কেউ থাকবে না। ফলে দেশটা ধীরে ধীরে সিভিল ওয়ারের দিকে এগোবে। একসময় বাংলাদেশটা ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়ায় পরিণত হবে। আমেরিকা ও ভারত মনেপ্রাণে এটাই চাইছে। এমনটা হলেই ওরা 'আমরা সমাধান করে দিচ্ছি' বলে এখানে বিড়ালের মতো মাথাটা ঢুকিয়ে দিতে পারবে।

তা ছাড়া চীন হলো সমাজতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র। চীনা নাগরিকদের অধিকাংশই নাস্তিক। এমন একটা নাস্তিক রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় চলা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্যু করে দখলে নিয়ে তা বেশি দিন ধরে রাখতে পারবে না। কারণ, তারা মুসলিম বিশ্বের সমর্থন পাবে না। আফগানিস্তানের মাটি থেকে সোভিয়েতকে তাড়াতে পশ্চিমারা যেভাবে প্রচার চালিয়ে পৃথিবীর সমগ্র মুসলিমকে এক করেছিল, পশ্চিমারা এই ক্ষেত্রেও দাবার সেই পুরোনো চালটাই দেবে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই চীনপন্থি অংশটাই আগামীর সেই তৃতীয় শক্তি। আগেই বলেছি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মডারেট মুসলিম। বাংলাদেশে ইসলামের যেই হাইব্রিড জোয়ার চলছে, এদের অধিকাংশই মডারেট মুসলিম। এদিকে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পছন্দ করে কিংবা অন্যায় দমন ও অধিকার রক্ষায় সেনাবাহিনীকে তাদের পাশে চায়। ওদিকে আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অপছন্দ করে। করোনার সময় 'কী লীগ কী লীগ' বলে সেনাবাহিনী কর্তৃক ছাত্রলীগ পেটানোর দৃশ্য ব্যাপক প্রশংসিত হওয়া এবং এ নিয়ে সাধারণ মানুষের আনন্দ প্রকাশ করার ধরনই সেটা বলে দিচ্ছিল। এ সবকিছু মিলিয়েই হিসাবটা দুয়ে দুয়ে চার মিলে গিয়ে তৃতীয় এই অদৃশ্য শক্তির উত্থান।

আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের ব্লকটা এই তৃতীয় শক্তিটাকে নিজেদের পক্ষে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। তাই 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস্ মেন', 'আয়নাঘর' ইত্যাদি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়, যেন সাধারণ মানুষকে এই তৃতীয় শক্তির বিপক্ষে ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। কারণ, আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের ব্লকটা বাংলাদেশে যদি সশস্ত্র আক্রমণ করেই বসে, তবে প্রথম সশস্ত্র জবাব আসবে এই তৃতীয় শক্তিটার কাছ থেকে। মজার বিষয় হলো, এই তৃতীয় শক্তিটার কারণেই বাংলাদেশের প্রশাসনের ভেতরে 'র'-এর প্রভাব এখন অনেকটা কমে গিয়েছে।

আচ্ছা, বাংলাদেশে ইসলামের জোয়ারকে নিজেদের পক্ষে কৌশলে কাজে লাগানোর জন্য এই তৃতীয় শক্তিটাও তো কোনো না কোনো আলেম বা বক্তা বা লেখক বা ইসলামিক দলকে কিনে নিতে পারে, পারে না? হ্যাঁ অবশ্যই পারে। আমার সন্দেহের তালিকায় আছে কয়েকজন/একটা দল। সময় ও সম্ভব হলে পরে বলব, ইনশাআল্লাহ।

সন্ধ্যাসীরা সন্ন্যাসী সেজেছে

এলাকার দুই দ্বীনি ভাইয়ের সাথে একদিন গল্প করছিলাম। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতির নানান বিষয়ে আমাদের ছোটো জ্ঞান নিয়ে প্রায়ই আমরা আলাপ করি। তো সেদিনের আলাপে রোহিঙ্গা ইস্যুটা উঠে আসলে তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগলেন। রোহিঙ্গা গণহত্যার পর বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য যারা যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন, সেখানে ওনারাও পাঁচ-ছয়জন ছিলেন। পুরান ঢাকার ছোট্ট একটা এলাকার ছোট্ট একটা মসজিদের সাধারণ মুসল্লিদের থেকে কয়েক লাখ টাকা সংগ্রহ করে রোহিঙ্গাদের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো সব টিলার ওপরে। এই টিলা থেকে ওই টিলায় দৌড়াদৌড়ি। তাদের বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছিল দিন দশেক। শেষমেশ শুধু ওই দুই দ্বীনি ভাই সেখানে সার্ভাইভ করতে পেরেছিলেন, বাকিরা ঢাকায় ফিরে আসেন। তারা দুজন কক্সবাজারের কলাতলিতে রাত কাটিয়ে সকালবেলা উখিয়া চলে যেতেন। কাজ শেষ করে আবার ফিরে আসতেন। কিছু নলকূপ বসিয়েছিলেন। একটা মসজিদ করেছেন।

একদিন অসামপ্ত মসজিদটার কাজ সমাপ্ত করতে কলাতলি থেকে উখিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। ফোনে হঠাৎ খবর এলো, সেনাবাহিনীর সদস্যরা মসজিদের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেছ। ব্যানার যারা লাগিয়েছে, সেই সেচ্ছাসেবীদের সেনাবাহিনী খুঁজছে। তাই এখন এখানে আসার দরকার নেই। খবরটা দিয়েছিল উখিয়ার স্থানীয় কিছু বাঙালি। যাদের সাথে তারা প্রথম দিন পরিচিত হয়েছিল। এই স্থানীয় বাঙালিরা তাদের ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। যাহোক। তারা ভাবল, তারা এসেছে অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে। এতে তো সেনাবাহিনী তথা বাংলাদেশ সরকারের উপকারই হচ্ছে। কিন্তু প্রশংসা পাওয়ার বদলে উলটো ভয় দেখানো হচ্ছে কেন? তাই মানা করা সত্ত্বেও তাদের দুজনের মধ্যে একজন সেখানে গেলেন। গিয়ে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। তাদের পরিচয়, কোথা থেকে এসেছেন, ত্রাণ তহবিলের উৎস কী ইত্যাদি। উত্তর সন্তোষজনক হলে পরে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা হয়।

আরেকজন গিয়েছিলেন অন্য আরেক টিলায়। সেখানে তিনি নলকূপ বসানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল করেন, তার মাথার ওপরে একটা সার্ভেইলেন্স

ড্রোন ওনার গতিবিধি অনুসরণ করছে। একটু পরেই ৩০-৪০ জন সেনা সদস্য এই স্থানে চলে আসে। উনি তখন একটু বুদ্ধি করে নিজেই সেনা সদস্যদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওই দলের সর্বোচ্চ অফিসারের সাথে তাদের ত্রাণ কার্যক্রমের বিষয়টা নিয়ে কথা বলেন। উনি বললেন, সেদিন তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে সেই সেনা অফিসারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই অফিসার ও সেনা সদস্যদের কথাবার্তা ও অঙ্গভঙ্গি কিছুটা রুক্ষ ধরনের ছিল। পরে অবশ্য কোনো ঝামেলা ছাড়াই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, ওনারা যেন উখিয়াতে রাত না কাটান। অন্যথায় যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে।

এমনকি তারা এমনও শুনেছেন, রোহিঙ্গাদের সাহায্য করতে যাওয়া একটা ইসলামি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের ত্রাণ তহবিল প্রশাসন থেকে জব্দ করা হয়েছে। সেচ্ছাসেবীদের প্রশাসন গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

গোলমেলে এসব কাণ্ডকারখানার হিসাব না মিলিয়েই হয়তো সেদিন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে তারা অবাক হয়ে চলে আসেন। অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। যেমন, এই তো সেদিন সিলেটে বন্যার ঘটনায় যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন, সেনাবাহিনী বা সরকারের পক্ষ থেকে কি কোনো চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল–যেন কেউ কোনো ত্রাণসামগ্রী নিয়ে সিলেটে না যায়? না। এমনটা হয়নি। হওয়ার কথাও না। পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্যোগ বা যুদ্ধে আক্রান্ত মানুষের সাহায্যের ব্যাপারে কেউ কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আশ্রয়দানকারী দেশের সরকারের তো বাধা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ, এতে সরকারের দায়িত্বটা সহজ হয়, খরচ বেচে যায়। কিন্তু রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে এসে বিষয়টা এমন উলটে গেল কেন?

প্যাঁচটা আসলে এখানেই। সমস্যা কিন্তু রোহিঙ্গাদের সাহায্য করা নিয়ে ছিল না। সমস্যা ছিল সাহায্যকারীদের নিয়ে। গণহত্যার পরপর রোহিঙ্গারা যখন বাংলাদেশে প্রবেশ করা শুরু করে, তখন তাদের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থসহায়তা আসতে থাকে। বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে অনেকেই সেখানে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। কে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ত্রাণ নিয়ে হাজির হয়েছিল, সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সেটা তদারকি করা হচ্ছিল।

কারণ, সেখানে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই সেচ্ছাসেবী না। দেশীয় এনজিও যেমন ছিল, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোও বেশ সক্রিয় ছিল। এখনও আছে। সেনাবাহিনী তথা বাংলাদেশ সরকারের মূল সমস্যাটা ছিল এই আন্তর্জাতিক ও দেশীয় এনজিওগুলোকে নিয়ে। আপনাদের হয়তো মনে আছে, বছর দু-তিনেক আগে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো এই আন্তর্জাতিক ও দেশীয় এনজিগুলোর কিছু কুকীর্তি বেশ ফলাও করে প্রচার করেছিল। সেই খবরগুলোতে দেখানো হয়েছিল–এরা বছরের পর বছর কক্সবাজারের বিলাশবহুল হোটেলে অবস্থান করে কোটি কোটি টাকা হোটেল ভাড়া দিয়েছে। বিদেশ থেকে পাঠানো দামি দামি ত্রাণসামগ্রীগুলো খোলা বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। কিছু স্কুল তৈরি করা, কিছু চিকিৎসা দেওয়া, কিছু খাদ্যসামগ্রী দেওয়া, জাতিসংঘের লোগোসংবলিত প্লাস্টিকের তাঁবু দেওয়া ইত্যাদি সবই আই ওয়াশ। মূলত এরা সেখানে সাহায্যের নামে সমস্যা আরও বাড়ানোর পাঁয়তারা করছিল। এখনও করছে। বিক্ষিপ্ত বিশাল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটা নির্দিষ্ট অংশকে এই এনজিওগুলো অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করছিল। পরবর্তী সময়ে কয়েকবার অসংখ্য ধারালো অস্ত্রও উদ্ধার করা হয় রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো থেকে। প্রশাসন তদন্ত করতে নামলে এসব অস্ত্রের সরবরাহকারী হিসেবে দেশীয় দু-একটা এনজিওর নাম উঠে আসে। দেশীয় এনজিওগুলো মূলত আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোরই ফুটসোলজার। এতে উদ্দেশ্য ছিল কক্সবাজারের এই অঞ্চলটাতে সর্বদা একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা। কীভাবে?

রোহিঙ্গারা গণহত্যার শিকার হয়েছে। রোহিঙ্গা নারীরা ধর্ষিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই রোহিঙ্গা তরুণদের ভেতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলবে। একটু সুযোগ পেলেই রোহিঙ্গা তরুণরা মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে পালটা হামলা চালিয়ে প্রতিশোধ নেবে। দরকার শুধু অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে রোহিঙ্গাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো এই আশায়ই বসেছিল। এখনও এই আশায়ই বসে আছে। এনজিওগুলোর এই উদ্দেশ্য যদি কোনোভাবে বাস্তবায়িত হতো, তাহলে এর ফলাফল দাঁড়াত–মিয়ানমার বাংলাদেশে আক্রমণ করত। জবাবে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকেও পালটা আক্রমণ করতে হতো। দুই দেশের মধ্যে শুরু হতো যুদ্ধ। এই সুযোগে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো আরও সুবিধাজনক অবস্থানে চলে আসত। ওদিকে বাংলাদেশের চিরশত্রু ভারত তো কবে থেকেই হা করে আছে বাংলাদেশকে গিলে ফেলার জন্য। বর্ডার নিরাপদ রাখার নাম করে ভারত ওর সীমানায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করত।

এত কিছু ঘটে গেলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় চলে যেত। তখন বুড়ো শয়তান আমেরিকা বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার সমস্যা সমাধান করার কথা বলে নাক গলাত। আর বিড়াল তো মাথাটা ঢোকাতে পারলেই হলো। একসময় পুরো শরীর ঢুকিয়ে দিত। শেষ পরিণতি—বাংলাদেশে আমেরিকা ওর সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে সক্ষম হতো।

আগেই বলেছি, চীনকে মোকাবিলা করতে বাংলাদেশের মাটি আমেরিকাকে ভৌগোলিক সুবিধা দেবে। এটা ছাড়াও আরেকটা কারণে বাংলাদেশ আমেরিকার সুইটেবল ব্যাটল গ্রাউন্ড। কীভাবে?

দেখুন, আমি যদি আপনার বাড়িতে অবস্থান করে আপনার পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর সাথে লড়াই করতে চাই, আপনি কিন্তু কখনোই তা মেনে নেবেন না; এখন আপনি আমার যত আপনই হোন না কেন। তো আপনাকে বাধ্য করতে হলে প্রথমে আপনার পরিবারের ভেতরে দ্বন্দ্ব তৈরি করতে হবে আমাকে। অশান্তি সৃষ্টি করতে হবে। তবেই-না আমি আপনার ব্যাপারে নাক গলাতে পারব। এরপর আপনার সমস্যা সমাধান তো করবই না; বরং সমস্যা বাড়াব। কারণ, আমার উদ্দেশ্য আপনার পরিবারকে তছনছ করে, আপনার বাড়ি তছনছ করে এটা একটা পরিত্যক্ত বাড়ি বানানো। এতে করে আপনার পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর সাথে (যে কি না আমার প্রধান শত্রু) আমার লড়াই করার পথটা সুগম হবে। আর বাংলাদেশ নামক পরিবারটার ভেতরে ইতোমধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে গেছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির যেই পর্যায়ে প্রবেশ করে ফেলেছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো, প্রথমে গৃহযুদ্ধ, এরপর বহিঃশত্রুর আক্রমণ।

দেখুন, আসমান থেকে যখন শাস্তি নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন তা প্রতিহত করার কেউ নেই। বাঙালি এমন একটা আমোদপ্রিয় উদাসীন জাতিতে পরিণত হয়েছে, যাদেরকে হুঁশে ফিরিয়ে আনতে বড়ো একটা ধাক্কা আবশ্যক হয়ে গেছে। কারণ, মুসলমান যদি **‘ঈমান আনার পর এ রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল আসার পর কুফরি করে (৩:৮৬)’**, তখন তাদের অবস্থা ইরাকি, সিরিয়ান, লিবিয়ানদের মতোই হয়। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই ভালো জানেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তিনি কীভাবে নির্ধারণ করেছেন।

সুতরাং মূল উদ্দেশ্যটা হলো–আমেরিকার চীনকে মোকাবিলা করতে হবে। তাই চীনের আশেপাশে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের এক বা দুটো দেশ লাগবে। সেই হিসেবে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দেশ দুটির জাতীয় রাজনীতি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, উভয় দেশেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার বারুদ ছড়ানো-ছিটানো আছে। কারণ, উভয় দেশের ক্ষমতাসীনরা দীর্ঘদিন ধরে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে রেখেছে এবং উভয় দেশের ক্ষমতাসীনদের ওপর তাদের সাধারণ নাগরিকরা ভীষণ রকমের অসন্তুষ্ট। তাই যেকোনো একটা দেশের যেকোনো একটা কোনা থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটাতে হবে শুধু। ব্যস, কেল্লা ফতে! হুহু করে দাবানল দুই দেশের প্রতিটি কোনে কোনে ছড়িয়ে পড়বে।

তাই প্রথমে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্ত অঞ্চলে ক্যাঁচাল তৈরির জন্য রোহিঙ্গা ইস্যুটা বেশ কার্যকর ও সময়োপযোগী দাবার গুটি। এই ইস্যু ধরেই আমেরিকা বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ আরও ঘোলাটে করবে। একসময় ব্যাপক গৃহযুদ্ধ বাধাবে। এর ফলে আমেরিকা এশিয়া-প্যাসিফিক ও ভারতীয় উপমহাদেশ অঞ্চলে বহুমুখী সুবিধা আদায় করতে পারবে। আর বিক্ষিপ্ত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করার সব প্রাথমিক পরিকল্পনা আমেরিকা ও ইউরোপ বাস্তবায়ন করছে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর দ্বারা।

এজন্যই দেখবেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে ভাসানচরে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর তুলনায় উত্তম থাকার জায়গা তৈরি করলেও রোহিঙ্গারা যেন ভাসানচরে না যায়, তাই আন্তর্জাতিক এনজিও এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো মায়াকান্না জুড়ে দিয়েছে। ভাসানচরে না যেতে রোহিঙ্গাদের উসকে দিচ্ছে। এমনকি একবার রোহিঙ্গাদের বড়ো একটা দল মিয়ানমারে ফিরে যেতে চেয়েও শেষ মুহূর্তে এসে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে এই এনজিওগুলোর প্রত্যক্ষ মদতে।

আপনাদের কি অবাক লাগে না! আমেরিকা নিজে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়ায় কোটি কোটি মুসলমান হত্যা করে রোহিঙ্গা মুসলমানদের হত্যার বিচারের জন্য এতটা উঠেপড়ে লেগেছে কেন? আমেরিকা এখন এতটাই তারাহুড়ো করছে যে, রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার করতে আন্তর্জাতিক আদালত নামক আমেরিকার আজ্ঞাবহ ক্যাঙারু কোর্টের কার্যক্রম ন্যাদারল্যান্ডসের হেগের বদলে এশিয়ার

কোনো দেশ থেকে পরিচালনা করা যায় কি না, সেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্যাঙারু কোর্টের ইতিহাসে এমন পদক্ষেপ এবারই প্রথম। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমেরিকা কতটা মরিয়া হয়ে আছে এখানে প্রবেশের ব্যাপারে।

বলবেন, আমি একজন মুসলমান হয়ে এতক্ষণ যা যা বললাম, তার পুরোটাই রোহিঙ্গা মুসলমানদের সাহায্য করার বিপক্ষে গেল। অথচ পবিত্র কুরআনুল কারিমের স্পষ্ট নির্দেশ হলো—কোনো মুসলমান জনগোষ্ঠী কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত হলে, মজলুম মুসলমানদের পক্ষ হয়ে অন্য মুসলমানরা জিহাদ ঘোষণা করবে। আমি কি তবে মুসলমানদের ক্ষতি করতে এসব কথার অবতারণা করেছি?

দেখুন, দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার কথাগুলোর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আমি আমার বক্তব্যের কোথাও বলিনি রোহিঙ্গা মুসলমানদের সাহায্য করা যাবে না। আপনার বা আপনাদের ক্ষমতা থাকলে মিয়ানমারের কাফেরদের বিপক্ষে গিয়ে জিহাদ করুন। যেমনটা আপনাদের জিহাদ করা উচিত ভারতের সেসব কাফেরদের বিপক্ষে, আমেরিকার সেসব কাফেরদের বিপক্ষে, ইউরোপের সেসব কাফেরদের বিপক্ষে, চাইনিজ সেসব কাফেরদের বিপক্ষে, সমগ্র বিশ্বের সেসব কাফেরদের বিপক্ষে; এমনকি নিজেদের নিকটবর্তী সেসব কাফেরদের বিপক্ষে, যে কাফেররা ইসলামের প্রতি আগ্রাসী আচরণ করছে। জিহাদ করুন, অথবা চুপচাপ বসে থাকুন, পুরোটাই আপনার বা আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি আপাতত সেসবের আলাপে যাব না। আমার কথাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল একটা বিষয়ে আপনাদের সচেতন করা যে, পরাশক্তিগুলো এই অঞ্চলকে ঘিরে যেই জটিল নীলনকশা তৈরি করে রেখেছে, আপনারা যেন সেটার ফাঁদে না পড়েন।

তো, মিয়ানমার হঠাৎ রোহিঙ্গাদের ওপর এমন গণহত্যা কেন চালাল?

মিয়ানমার ১৯৪৮ সালে বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৬২ সাল পর্যন্ত একটানা ১২ বছর সংসদীয় সরকারব্যবস্থা ছিল সেখানে। এরপর সামরিক ক্যু হয়ে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত টানা ২৬ বছর সামরিক সরকার ছিল। এরপর আবার সামরিক ক্যু করে অপর এক সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে। এরা ক্ষমতায় ছিল ২০১১ সাল পর্যন্ত। ২৩ বছর। ২০১১-২০২১ তথাকথিত জনগণের সরকার ক্ষমতায় থাকলেও, ভেতর থেকে দেশ পরিচালনা করত মিয়ানমার সেনাবাহিনী। ২০২১ সালে তৃতীয়বারের মতো সামরিক ক্যু করে সামরিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে, যা এখনও চলমান। তাহলে হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে, মিয়ানমারে অধিকাংশ সময়ই সামরিক শাসন চলেছে। এখনও চলছে। আসলে এটা মিয়ানমারের দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। বলতে গেলে মিয়ানমারে আজকে ষাট বছর ধরে থেমে থেমে সিভিল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধ হচ্ছে।

মিয়ানমারে একাধিক জাতিগোষ্ঠী আছে। এদের মধ্যে বামাররা (এই বামারদেরকেই বার্মিজ বলা হয়) সংখ্যায় অধিক এবং অন্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করেছে; বিশেষ করে রাজনৈতিক বিষয়ে। মিয়ানমারকে স্বাধীন করার পেছনে এই বামারদের ত্যাগ ও ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই মিয়ানমারে বামারদের কর্তৃত্ব বেশি। মিয়ানমারে দীর্ঘ সময় ধরে যেই সামরিক শাসন চলছে, এই শাসকশ্রেণির সবাই বামার জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ স্বাধীন হওয়া পর থেকে মিয়ানমার দেশটা বামারদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যা মিয়ানমারের অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলো শুরু থেকেই মেনে নিতে চাচ্ছে না। ১৯৮৯ সালে দেশের নাম বার্মা থেকে বদলে মিয়ানমার নামকরণেও তেমন একটা লাভ হয়নি। শুধু রাখাইন বা আরাকান রাজ্যই না; চিন, সাগায়িং, কাচিন, শান, কায়িন, তানিনথারি ইত্যাদি অধিকাংশ রাজ্যই স্বায়ত্তশাসন কিংবা স্বাধীনতা চায়। বামাররা সেটা দিতে নারাজ। এমনকি অন্য জাতিগোষ্ঠীর রাজনীতিবিদদেরও বামাররা রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করে রেখেছে। দ্বন্দ্বটা মূলত এটা নিয়েই।

ফলে মিয়ানমারের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো প্রত্যেকেই নিজ নিজ সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেছে। যেমন :

১. আরাকান আর্মি :

সদস্য–৩০ হাজার

প্রতিষ্ঠা–২০০৯

প্রদেশ–চিন, কাচিন, শান, রাখাইন

২. কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মি :

সদস্য–১০-১২ হাজার

প্রতিষ্ঠা–১৯৬১

প্রদেশ–কাচিন

৩. ক্যারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি :

সদস্য–৭ হাজার

প্রতিষ্ঠা–১৯৪৯

প্রদেশ–কায়াহ, কায়িন, তানিনথারি

৪. মোন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি :

সদস্য–৩-৫ হাজার

প্রতিষ্ঠা–১৯৫৮

প্রদেশ–মোন, তানিনথারি

৫. পিপল ডিফেন্স ফোর্স : আর্মড উইং অব ন্যাশনাল ইউনিটি গভট্।

সদস্য–৫০ হাজার

প্রতিষ্ঠা–২০২১

প্রদেশ–গোটা মিয়ানমারের স্বাধীনতাকামীদের সমন্বয়ে গঠিত

৬. শান স্টেট আর্মি নর্থ :

সদস্য–৮ হাজার

প্রতিষ্ঠা–১৯৭১

প্রদেশ–শান

৭. শান স্টেট আর্মি সাউথ :

সদস্য–৮ হাজার

প্রতিষ্ঠা–১৯৯৬

প্রদেশ–শান

৮. ইউনাইটেড ওয়া স্টেট আর্মি :

সদস্য–২৫ হাজার

প্রতিষ্ঠা–১৯৮৯

প্রদেশ–শান

৯. যোমি রেভোলুশনারি আর্মি :

সদস্য–৩ হাজার

প্রতিষ্ঠা–১৯৯৭

প্রদেশ–চিন

১০. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি :

সদস্য–৩-৪ হাজার

প্রতিষ্ঠা–১৯৮৯

প্রদেশ–শান

১১. মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি :

সদস্য–১০ হাজার

প্রতিষ্ঠা–১৯৮৯

প্রদেশ–শান (কোকাং অঞ্চল)

১২. ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড :

সদস্য–১৫ হাজার

প্রতিষ্ঠা–১৯৮০

প্রদেশ–চিন (মিয়ানমার) ও নাগাল্যান্ড (ভারত)

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের প্রধান অং সান সুচির বাবা অং সানও বামার এবং মিলিটারি ব্যাকগ্রাউন্ড। অং সান ছিল মিয়ানমারের জাতির পিতা। মিয়ানমারকে স্বাধীন করার পেছনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ছিল, সুচির বাবা ছিল তাদের নেতা। কিন্তু সুচির বাবা অন্য রাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে থাকায় তাকে '৪৭ সালে গুপ্ত হত্যার শিকার হতে হয়। সুচি তার বাবার মতো গণতান্ত্রিক ভাবধারার হওয়ায় পশ্চিমের সমর্থন পেয়েছে। পাকিস্তানের ইমরান খানের মতো সুচিকেও বিশ্ব রাজনীতির আইকন বানিয়েছিল পশ্চিমারাই। শান্তিতে নোবেল প্রাইজও দিয়েছিল পশ্চিমারা। কিন্তু ইমরান খান যেমন পশ্চিমা ব্লক থেকে ডিগবাজি দিয়ে চীনা ব্লকে ঢুকেছে, রোহিঙ্গা গণহত্যার বিষয়ে সুচিও তেমন আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের বামার তথা জান্তা সামরিক বাহিনীর পক্ষ নিয়ে রোহিঙ্গা গণহত্যাকে খাড়াখাড়িভাবে অস্বীকার করে একইভাবে ডিগবাজি দিয়েছে। এই ডিগবাজি ডিগবাজি খেলা সবই হচ্ছে নতুন পরাশক্তি চীনের প্রভাবে।

যাহোক। শুধু রোহিঙ্গারাই না; মিয়ানমারের সবগুলো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বামারদের দ্বারা চরমভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত। বামার কর্তৃক মিয়ানমারের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর নিরীহ মানুষকে হত্যা, ধর্ষণ, বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক গোটা গ্রাম উচ্ছেদ, ফল-ফসল নামমাত্র মূল্যে ক্রয়, ভয়ভীতি দেখিয়ে শ্রম আদায়, খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি মানবতাবিরোধী কাজ বছরের পর বছর ধরে চলমান। ফলে শান, ক্যারেন, রাখাইন (আরাকান), মোন, কুকি, কাচিন, ক্যারেনি ইত্যাদি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লাখ লাখ মানুষ উদ্‌বাস্তু হয়ে থাইল্যান্ড, ইন্ডিয়া, চীন ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী এসেছিল ১০ লাখ। বর্তমান পৃথিবীতে এককভাবে একটা দেশে এতসংখ্যক শরণার্থী আসার এটাই সর্বোচ্চ রেকর্ড। মানবেতিহাসে মুসলমানদের ওপর চালানো সকল গণহত্যার মধ্যে এটা ছিল অন্যতম। ৭.৫ লাখ ক্যারেন ও ক্যারেনি শরণার্থী নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে থাইল্যান্ড। মিয়ানমার স্বাধীন হওয়ার পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত এসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপরে বিভিন্ন সময়ে যেমন আক্রমণ করা হয়েছে, রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপরেও তেমন আক্রমণ করা হয়েছে। তবে রোহিঙ্গাদের বেলায় মাত্রাটা একটু বেশি। ২০১৭ সালের আক্রমণটাই প্রথম না। এর আগেও রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। তবে শেষবারেরটা ছিল সবচেয়ে ও অন্য সবার চেয়ে নৃশংস। আর রোহিঙ্গা গণহত্যাটাই ধর্তব্য। কেন?

বামাররা হলো উগ্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মূর্তিপূজারি। আমাদের ভেতরে একটা ভুল ধারণা হলো–আমরা মনে করি, বৌদ্ধরা এক গৌতম বুদ্ধের উপাসনা করে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বৌদ্ধদের কোনো প্যাগোডাতে কখনো গেলে দেখতে পাবেন, ওখানে সমান আকৃতির একাধিক বড়ো বড়ো মূর্তির পাশাপাশি ছোটো-বড়ো মিলিয়ে আরও অনেক মূর্তি আছে। বৌদ্ধরা এ সবগুলোরই উপাসনা করে। সবগুলোর সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। সুতরাং এককথায় এরাও হিন্দুদের মতোই মুশরিক। আর মুশরিকরা মুসলমানদের প্রতি সবচেয়ে বেশি শত্রুভাবাপন্ন। এটা হলো একটা কারণ।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমারা হলো ফিতনাবাজ ও যুদ্ধবাজ। অন্যের ঘরে আগুন লাগিয়ে যুদ্ধ বাধাতে প্ররোচিত করে, যেন অস্ত্র বিক্রি করে সেখান থেকে ফায়দা নেওয়া

যায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই জাতিগত দ্বন্দ্ব থাকে। ভিন্নমতাবলম্বী থাকে। যদি কোনো দেশে পশ্চিমাদের কোনো স্বার্থ থাকে, আর সেখানকার সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীরা বা ভিন্নমতাবলম্বীরা পশ্চিমাদের পক্ষ হয়ে কাজ করে, তবে সেই দলগুলোকে পশ্চিমারা পূর্ণ সমর্থন দেয়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইস্যু তুলে তখন উষ্ণ ও তুলতুলে মানবপ্রেম দেখায়। অথচ পৃথিবীর অনেক প্রান্তেই সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে। সেই ব্যাপারে কিন্তু এই পশ্চিমারা একেবারেই চুপ। কারণ, এই ক্ষেত্রে হিসাবটা উলটে গেছে। অর্থাৎ, এবার উক্ত দেশটির ক্ষমতাসীনরাই পশ্চিমাদের পক্ষ হয়ে কাজ করছে। তাই উক্ত দেশটিতে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলো কি হলো না, তাতে পশ্চিমাদের কিচ্ছুটি ছেঁড়া যায় না; স্বার্থ হাসিল হওয়া দিয়ে কথা ওদের। যেমন : কাশ্মীর। অনেক ক্ষেত্রে তো ওরা নিজেরাই বছরের পর বছর ধরে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

তো, বর্তমান সমীকরণ হলো—স্বার্থজনিত কারণেই হোক অথবা বিনা কারণে, মিয়ানমারের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বা সংখ্যালঘুরা পশ্চিমা তথা আমেরিকার পক্ষে। ধর্মে অধিকাংশই খ্রিষ্টান। উলটো দিকে বামাররা হলো বৌদ্ধ ও চীনঘেঁষা। তাই বামাররা সংখ্যালঘুদের দমন করতে গেলেই পশ্চিমাদের রোষানলে পড়ছে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আসছে। পশ্চিমা মহলে বয়কটের ডাক উঠছে। তাই উপায় একটা বের করতেই হয়।

বিংশ শতক থেকে চলমান একটা ধারা হলো—মুসলমান মারলে কারও কাছে কোনো কৈফিয়ত দেওয়া লাগে তো না-ই; বরং উলটো বাহবা পাওয়া যায়। ইবলিস ও দাজ্জালের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিশ্ব পরিচালনা ব্যবস্থার জাতে উঠতে হলে সবচেয়ে সহজ একটা উপায় হলো—ইসলামবিদ্বেষী হওয়া এবং মুসলমান হত্যা করা। একটা জাতি কোনো কারণে আড়ালের এই অপশক্তির (গডফাদার ইবলিস ও একচোখা দাজ্জাল। চামচা হিসেবে আছে ইহুদি, আমেরিকা ও ইউরোপ। এরাই আসল মাফিয়া।) বিরাগভাজন হয়ে গেলে মুসলমান মেরে ওদেরকে খুশি রাখে। এই একটা জায়গায় এসে সব রসুনের পশ্চাদ্‌দেশ মিলে গেছে।

বামার বৌদ্ধরা দেখল—আমেরিকাকে অসন্তুষ্ট করে চীনের গুড় খাচ্ছি। একই কারণে ওদিকে ভারতও বেজার হয়ে আছে। ভারত বেজার হলে ভারতের সাথে কমন বর্ডার অঞ্চলগুলোতে স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠীর ব্যাপারে ভারত সহায়তা দেবে না। রাশিয়ার কাছ থেকে দেদারসে অস্ত্র কেনার কারণে আমেরিকা দ্বিগুণ

খ্যাপা। সাথে ইউরোপও খ্যাপা। ফলে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার চাপ বাড়ছে। চীনকে অসন্তুষ্ট করলে চীনের সাথে কমন বর্ডার অঞ্চলগুলোতে মিয়ানমারের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠীরা চীনের কাছ থেকে আগের মতো সুবিধা পাওয়া শুরু করবে। ওদিকে চীনের মধ্যস্থতায় থাইল্যান্ড স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে মিয়ানমারের সাথে কমন বর্ডার অঞ্চলগুলোতে আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করেছে। চীনকে খ্যাপালে এটাও উলটে গিয়ে আগের পরিস্থিতি তৈরি হবে। সবকিছু মিলিয়ে সবাইকে খুশি করার উপায় একটাই। আর তা হলো—রোহিঙ্গা মুসলমান গণহত্যা।

এই কুবুদ্ধির প্রত্যক্ষ ইন্ধনদাতা ভারত। ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতাকামী রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীকে অনেকভাবে সহায়তা করত। এর প্রধান কারণ হলো—ভারত ও মিয়ানমার সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে মুসলমান রোহিঙ্গারা শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারলে ভারত বেশ চাপে থাকবে। '৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের হাতছাড়া না হলে এই পরিকল্পনা বেশ কার্যকর হতো এখন। আর সেই পুরোনো ভয় ভারতের এখনও আছে। ভারত রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে নিজের জন্য পসিবল থ্রেট বা সম্ভাব্য হুমকি মনে করে। তাই ভারত কোনোভাবেই চায় না যে, সেভেন সিস্টার্স, ওর সবচেয়ে নাজুক অঞ্চলের আশেপাশে একটা মুসলমান সশস্ত্র গোষ্ঠী গড়ে উঠুক। ফলে ইয়াবা ও মদে আসক্ত বামার মিলিটারি ভবিষ্যৎ ফলাফলের কথা না ভেবে ভারতের প্রত্যক্ষ উসকানিতে বমিটা শেষমেশ করেই ফেলল। অর্থাৎ গণহত্যা চালাল।

মিয়ানমার ভেবেছিল—সবাই মুসলমান মারে। আমি মারলে দোষ হবে না; বরং সবাই খুশি হবে। ভারতের হিন্দু 'দ্য মুতখোরস্'গুলো দিনের পর দিন মুসলমান হত্যা করছে। পশ্চিম তো ভারতকে কিছুই বলে না। আবার সেই ভারত আমার পক্ষেও আছে। তাই বাই ডিফল্ট কিছু যদি হয়েই যায়, তবে আমেরিকার নতুন চাকর ভারতকে দিয়ে মনিব আমেরিকাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ম্যানেজ করে ফেলা যাবে। কিন্তু বামারগুলো বুঝতেই পারেনি, এটা ছিল একটা চাল। ফলে গণহত্যা করার সাথে সাথে মিয়ানমার পশ্চিমাদের ফাঁদে পড়ে। কারণ, এই একটা ইস্যু তুলে আমেরিকা ও ইউরোপ ওদের চাকর ভারতকে সাথে নিয়ে এই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে দীর্ঘমেয়াদি একটা ক্যাঁচাল তৈরি করবে; মূল লক্ষ্য চীনকে মোকাবিলা করা। তাই বড়ো কুকুর আমেরিকা ও ইউরোপ মিডলইস্টে মুসলমান গণহত্যা চালিয়ে হাতে লেগে থাকা মুসলমানের কাঁচা রক্তগুলো ধুয়ে এসে রোহিঙ্গা গণহত্যা নিয়ে ছোটো কুকুর মিয়ানমারকে শাসানো শুরু করল। আমেরিকার

আঞ্জাবহ আন্তর্জাতিক আদালত নামক ক্যাঙারু কোর্টে গাম্বিয়াকে দিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করালো।

মিয়ানমার যেহেতু চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রজেক্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশে নিজেকে যুক্ত করে ভূরাজনীতিতে নিজের অবস্থান পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে, তাই এই রোহিঙ্গা মুসলমান গণহত্যার ইস্যু দিয়েই পশ্চিমারা মিয়ানমারকে কোণঠাসা করেছে। বামাররা এখন নিজের বমি গিলতেও প্রস্তুত। অর্থাৎ রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু প্রত্যাবাসনের বিষয়ে ভারত সম্পূর্ণ চুপ। ভারত চুপ, কারণ পশ্চিম চায় না যে প্রত্যাবাসন হোক। কেন চায় না, আগেই তা উল্লেখ করেছি।

ওদিকে চীনও চুপ। অথচ চীন একটু জোর দিয়ে চাইলেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত হয়। চীন তবুও করছে না। কেন? কারণ, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সবাই নিজের স্বার্থটা আগে দেখে। বাংলাদেশের মতো একটা সল্প আয়ের দেশের জন্য ১০-১২ লাখ শরণার্থী অনেক বড়ো একটা চাপ। চীন ১০-১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসনের ইস্যুটাকে সমাধান করার বদলে ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে আওয়ামী লীগ তথা বাংলাদেশকে সমঝোতার টেবিলে একটু চাপে রেখেছে। যেন বিশ্ব রাজনীতির দোলাচলে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো পরিস্থিতিতে পড়েও বাংলাদেশ চীনের হাত থেকে ফসকে গিয়ে আমেরিকার হাতে চলে না যায়।

এর মূল কারণ হলো—বাংলাদেশ এখনও ভূরাজনীতিতে নিজের অবস্থান পরিষ্কারভাবে জানায়নি। বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের বক্তব্য হলো—আমরা যুদ্ধ চাই না; শান্তি চাই। সবার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে চাই। কিন্তু এই কথাগুলো যতটা বাস্তব, এর থেকেও কঠিন বাস্তবতা হলো—মহাযুদ্ধে চাইলেও নিজেকে নিরপেক্ষ রাখা যায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে যেতেই হয়।

বনের বড়ো দুই হিংস্র জন্তু লড়াইয়ে লিপ্ত হলে ছোটো ছোটো কীটপতঙ্গরা পায়ের নিচে পড়ে এমনিতেই পিষে যায়। কীটপতঙ্গ মরল নাকি বাঁচল, মরলে কতটা মরল—এসবে ওই হিংস্র জন্তু দুটির কিছু যায় আসে না। বনের ভেতরে নিজের আধিপত্য বিস্তার করাটাই ওদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে।

আবারও পরাশক্তির পালাবদল মানে আবারও একটা মহাযুদ্ধ। আবারও কান্না, আর্তনাদ, হাহাকার, ক্ষুধা, ধর্ষণ, রক্তপাত, গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ। ইতিহাসে যতবার পরাশক্তির পালাবদল হয়েছে, যতবার ক্ষমতা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়েছে, ততবার এই পৃথিবী মানুষের রক্তের সাগরে ভেসেছে। তবুও দিনশেষে মুসলমানরাই সন্ত্রাসী। আর ওরা সবাই সন্ন্যাসী।

ইতি কথা

★ এগুলো একান্তই আমার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। এর সাথে একমত হতে পারেন, নাও হতে পারেন। সেটা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার সাথে একমত হতে জোর করব না। এই হিসাবগুলো আরও প্রায় চার বছর আগে মিলিয়ে রেখেছিলাম। কথাগুলো লিখব লিখব করে আর লেখা হয়ে ওঠেনি।

★ কোনো কোনো কথা কারও পক্ষে গিয়েছে। কোনো কোনো কথা কারও বিপক্ষে গিয়েছে। একেবারে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে আলোচনা করেছি।

★ কোনো একপক্ষ নিজের স্বার্থের জন্য এমন এমন পদক্ষেপ নিয়েছে এবং নেবে, যা অন্য পক্ষের জন্য উপকারী হবে। যেমন :

১. আওয়ামী লীগ নিজের উপকার করতে যা করছে, তা কাকতালীয়ভাবে বাংলাদেশকে পরাশক্তিদের ব্যাটল গ্রাউন্ড হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করছে। তবে আওয়ামী লীগ খুব বেশিদিন এই ধারা অব্যাহত রাখতে পারবে না। কারণ, পশ্চিমের পরাশক্তিরা যে করেই হোক আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করবে।

২. আমেরিকাপন্থি সেক্যুলাররা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ইসলামপন্থিদের তেল মালিশ করছে। চাটুকারিতা করে ইসলামি ভাবধারার নানা রকমের বক্তব্য দিচ্ছে। নিজেদের ইসলামের পরম বন্ধু হিসেবে জাহির করছে। কারণ, মাঠে নেমে রক্ত দেবে বা দেওয়ার মতো সাহস ও চেতনা একমাত্র ইসলামপন্থিদেরই আছে। একই কাজ আওয়ামী লীগও করছে, আমেরিকাও করছে।

৩. আমেরিকা চীনকে মোকাবিলা করে এই অঞ্চল নিজের দখলে রাখার জন্য বাংলাদেশ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের বন্ধু সেজেছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা করছে। আদতে এসবই ফাঁকি।

★ দক্ষিণ এশিয়ার এপাশে যুদ্ধ যদি লেগেই যায়, তবে অখণ্ড ভারত তো হবেই না; বরং ভারত ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে যাবে। বাংলাদেশটা তখন দখল হয়ে যেতে পারে। আবার বাংলাদেশ অখণ্ড বাংলাকেও পুনরুদ্ধার করতে পারে। তবে অখণ্ড বাংলা পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে–যদি ক্ষমতা একমাত্র ইসলামপন্থিদের হাতে থাকে।

★ এই যুদ্ধের রেশ ধরেই আমেরিকা ও ইউরোপের পতন হবে। চীন সর্বোচ্চ পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে।

★ এই যুদ্ধের রেশ ধরেই উপমহাদেশে পুনরায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। 'হিন্দুস্তানে মহাযুদ্ধ'-বিষয়ক হাদিসগুলো বাস্তবে ঘটতে থাকবে।

★ বাংলাদেশে মোদির সফরের সময় আন্দোলনকারী মুসলমানের ওপর গুলি চালিয়ে আওয়ামী লীগের তিনটি লাভ হয়েছিল–

১. মোদিকে মেসেজ দেওয়া যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তোমাকে ঘৃণা করে। আওয়ামী লীগ না থাকলে তোমাদের কী হবে? সুতরাং আমাকে উৎখাত করে বাংলাদেশ দখল করার দিবাস্বপ্ন দেখো না।

২. মুসলমান মেরে ভারত ও বাংলাদেশের হিন্দুদের আস্থা অর্জন। ফলে মোদি চাইলেও হিন্দু জনগণের বিপক্ষে গিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করতে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে না। (যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপট হলো–বাংলাদেশের হিন্দুরাই এখন সবচেয়ে বড়ো এন্টি আওয়ামী লীগ।)

৩. মুসলমান মারলে পশ্চিমারা বেশ খুশি হয়। ২০১৮ সালে রাতের ভোটের কারণে আওয়ামী লীগের গায়ে যেই কালি লেগেছিল, মুসলমানের রক্তে সেই কালি কিছুটা ধুয়ে গেল।

★ 'ওই দিকে মুসলমান সন্ত্রাসীরা আছে। তাই নিজের ঝুঁকি নিয়ে হলেও আমাকে ওইখানে হামলা করতে হবে।' এবং 'মুসলমান সন্ত্রাসীদের হাত থেকে তোমাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একমাত্র আমিই পারদর্শী।' এই স্লোগান দুটো আমেরিকার। এইটা দিয়ে আমেরিকা মুসলিম বিশ্বে হত্যাযজ্ঞ চালানোর বৈধতা নিয়েছে এবং

নিজেকে বিশ্বের মোড়ল বানিয়ে রেখেছে। জাতীয় নির্বাচন সামনে চলে আসলে এই একই পরিকল্পনা কিন্তু আওয়ামী লীগও করে।

★ আমেরিকা ও ইউরোপের দালাল কীভাবে চিনবেন? যারা পশ্চিমাদের Anti-Islam বা ইসলামবিদ্বেষী মনোভাবকে Islamophobia বা ইসলামভীতি বলে প্রচার করে, তারাই আমেরিকা ও ইউরোপের পাক্কা দালাল। এর মানে হলো–আপনার শত্রু আপনাকে শত্রুতা করে মারছে। আর সেটাকে বলা হচ্ছে–সে আপনাকে দেখে ভয় পেয়ে আপনার সাথে এমন আচরণ করেছে।

★ পেছনের আলোচনায় আমেরিকা ও ইউরোপের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই পশ্চিমারা বাংলাদেশ থেকে শুরু করে চীনের মিত্র দেশগুলোতে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দেয়।

★ এ পর্যন্ত যতবার পরাশক্তির পালাবদল হয়েছে, ততবারই মহাযুদ্ধ বেধেছে। নতুন পরাশক্তি হিসেবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে এবার এসেছে চীন। তো পুরোনোদের সাথে চীনের মহাযুদ্ধ হবে না, তা কী করে হয়?

★ আমি ধরে নিলাম, বাংলাদেশের পার্বত্য তিন জেলা স্বাধীন জুম্মল্যান্ড হয়ে গেল। এরপর অদূর ভবিষ্যতে ফলাফল দাঁড়াবে–বামার কর্তৃক মিয়ানমারের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীরা যেভাবে যুগের পর যুগ নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিহত হচ্ছে, চাকমাদের হাতেও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীরা সেভাবেই যুগের পর যুগ নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিহত হবে। মনে রাখবেন–চাকমারা বামারদেরই প্রতিরূপ।

★ কয়েক বছর আগে হাসান সোহরাওয়ার্দী নামে অনেক ঊর্ধ্বতন এক সেনা কর্মকর্তা লাইভ ইন্টারভিউতে এসে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কিছু মন্তব্য করেছে। যেটা কিনা সেনাবাহিনীর মতো একটা স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয়। এই সেনা কর্মকর্তা সেনাপ্রধান হতে পারেনি বলে আমেরিকার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। একটা দেশের সামরিক বাহিনী ধ্বংস হওয়া মানে অতি সহজেই সেই দেশটাকে গিলে ফেলা যাবে। শুরুটা পিলখানা গণহত্যা দিয়ে হয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হিন্দুত্ববাদের হাতে নিহত। 'আয়নাঘর' নামক

সো কল্ড ডকুমেন্টারিতে সাবেক কর্নেল হাসিনুরের সেনাবাহিনীবিরোধী মন্তব্য–এসব একই সুতায় গাঁথা।

★ বাংলাদেশের আকাশে শকুনের আনাগোনা অনেক আগে থেকেই। তবে ধীরে ধীরে শকুনেরা নিচে নেমে আসছে। বহিরাগত শকুনরা কোনো দেশে শুরুতেই আক্রমণ করে না। এটা খুব ধীর একটা প্রক্রিয়া। প্রথমে এরা কৌশলে একটা জাতিকে বিভিন্নভাবে পথভ্রষ্ট করে, যেন নিজের প্রকৃত স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামানো তো দূরের কথা, প্রকৃত স্বার্থ কোনটা, সেটাই বোঝার মতো জ্ঞান সে জাতির না থাকে। চলমান কোনো বিষয় নিয়ে ন্যূনতম বিচার-বিশ্লেষণক্ষমতাকে প্রতিস্থাপন করে দেওয়া হয় স্পোর্টস, মুভি, মিউজিক, হ্যাঙআউট, গেটটুগেদার ট্রেন্ডিং ইত্যাদি নানা রকম বিনোদন দিয়ে। মোটকথা, হুজুগে চলা একটা জাতি তৈরি করে ফেলা হয়–যারা কি না বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা দেখবে, তা-ই বিশ্বাস করবে। এমন একটা মেরুদণ্ডহীন জাতির সামনে যদি কোনো বিপদ এসে দাঁড়ায়, তখন সে জাতি গুজবে কান দিয়ে সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে উলটো দ্বিগুণ সমস্যা বাড়িয়ে দেয়।

★ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরোধিতা এ দেশের অনেক মাথামোটা তরুণরাই করেছে, করছে। বিরোধিতাকারী এসব তরুণদের অধিকাংশই আবার আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতপন্থি তথাকথিত সেক্যুলার ও নাস্তিক। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র একটা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে নিরাপদ বেষ্টনী গড়ার হাতেখড়ি। কারণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বানানো মানে–এসব প্রযুক্তি বাংলাদেশে নাড়াচাড়া হবে, গবেষণা হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের পরমাণু বিশেষজ্ঞরা আরও দক্ষ হয়ে উঠবে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি আর পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির মূল প্রযুক্তি একই। তবে যেহেতু দুটোর উদ্দেশ্য ভিন্ন, অর্থাৎ কন্ট্রোলড্ ফিশন ও আনকন্ট্রোলড্ ফিশন। তাই কিছু তারতম্য থাকে। তো কথা হলো, ন্যূনতম জ্ঞান আছে–এমন কোনো সচেতন তরুণ এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরোধিতা কখনোই করবে না। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরোধিতা করাটা এই মাথামোটা তরুণরা শিখেছে সুশীল নামক এ দেশীয় কিছু দালালশ্রেণির কাছ থেকে–যারা বহিরাগত শকুনদের কাছে নিজেদের মাথা বিক্রি করে দিয়ে দেশের স্বার্থবিরোধী নানান পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করে। কিন্তু এদের গায়ে থাকে দেশপ্রেমের জামা। এদের কথাবার্তায় ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায় না যে, এরা মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে কীভাবে পেছন থেকে ছুরি মেরে একটা জাতির সাথে বেইমানি করছে। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়, এই সুশীলদের দেশপ্রেম উপচে উপচে পড়ে। অথচ

বাস্তবতা হলো–এরা পাক্কা দেশদ্রোহী। এরা সামান্য কিছু টাকার লোভে গোটা দেশের মানুষের জন্য বিশাল গর্ত খুঁড়ে যাচ্ছে।

★ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি একটা কুচক্রী মহল অনেক আগে থেকেই তৎপর। কারণ, ওরা কোনোভাবেই চায় না যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো দেশে পারমাণবিক অস্ত্র থাকুক। এর মানে এই নয় যে, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থাকলে বাংলাদেশ পরমাণু অস্ত্র তৈরি করবে। তবে একটা সম্ভাবনার দুয়ার খুলবে। কুচক্রী মহলটা এই সম্ভাবনাকেও সহ্য করবে না। অথচ নিজেরা হাজার হাজার পরমাণু অস্ত্র তৈরি করে রেখেছে। ইরাকের নিউক্লিয়ার প্রজেক্টে কাজ করা মিশরীয় পরমাণুবিজ্ঞানী Yahya El Mashad-কে প্যারিসের একটি হোটেলে ১৯৮০ সালে মোসাদ গুপ্ত হত্যা করে। একই সালে একাধিক ইরাকি পরমাণুবিজ্ঞানীকে গুপ্ত হত্যা করা হয়। এদের একজন হলেন ইঞ্জিনিয়ার Abd al-Rahman Rasoul, যার চুক্তি ছিল নিউক্লিয়ার স্থাপনা তৈরি করে দেওয়া। ১৯৮১ সালে জিনিভাতে Salman Rashid al-Lami নামে আরও একজন পরমাণুবিজ্ঞানীকে গুপ্ত হত্যা করা হয়। ইরাকের নিউক্লিয়ার উইপন প্ল্যান্টে তো আমেরিকার পোষা কুকুর ইজরাইল বিমান হামলাই চালাল। এ তথ্য তো সবারই জানা। সীতাকুণ্ডে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডের পরদিন বাংলাদেশের তিনজন পরমাণু বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রহস্যজনক এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। পরপর ঘটে যাওয়া দুটো রহস্যজনক ঘটনার ১২ দিন আগের খবর : বঙ্গোপসাগরে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার চেয়েও উচ্চমানের ইউরেনিয়ামের সন্ধান পেয়েছে বাংলাদেশ। (সাগরে ইউরেনিয়ামের অনুসন্ধান ১২ বছর আগে থেকেই চলছিল। তবে সেদিন সন্তোষজনক কিছুর সন্ধান মিলেছে।)

★ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেই জায়গায় বিএনপি অথবা তৃতীয় কোনো দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে দিয়ে আমেরিকার কোনো লাভ নেই। আমেরিকা 'সুন্দর বাংলাদেশ' গড়ার কথা বলে বর্তমান সরকারব্যবস্থা ভেঙে দেবে ঠিক; কিন্তু কস্মিনকালেও পরবর্তী সময়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন একটা সরকার গঠন করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখবে না। রাখলে ওর কেনো লাভ হবে না। আমেরিকার দরকার এমন একটা রাষ্ট্র–যেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল অবস্থায় আছে; যেকোনো সময় গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে। তাহলে আমেরিকা এখানে সমাধান

করার নামে মিলিটারি প্রবেশ করাতে পারবে। মিলিটারি কেন প্রবেশ করাবে, এর উত্তর পেছনে বিস্তারিত বলেছি।

★ বর্তমান বিএনপির ওপরের খোলসটা বিএনপির, ভেতরটা আমেরিকার চামচা দিয়ে ভরা। এটা হাইব্রিড বিএনপি। উপরন্তু, আমার ধারণামতে, বিএনপি ২-৩ ভাগে বিভক্ত। এমনকি বিএনপির বড়ো বড়ো অনেক নেতারা আওয়ামী লীগের কাছে বিক্রিও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। যদি আগামী বছর মিরাকুলাস কোনো কিছুর মাধ্যমে বিএনপিকে ক্ষমতায় বসানো হয়ও, সেই বিএনপি সরকারকে অল্প সময় টিকিয়ে রাখা হবে। উদ্দেশ্য–রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির করে তোলা। ওই অল্প সময়ের জন্য ড. ইউনূসের মতো কোনো পশ্চিমা গোলামকে দেশের প্রধান বানানো হতে পারে। এটা আমেরিকা ইচ্ছে করেই করবে। তবুও ওরা বিএনপিকে ক্ষমতায় আনবে স্রেফ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য।

★ আফগানিস্তানে তৎকালীন সোভিয়েতকে মোকাবিলা করার জন্য আমেরিকা ও ইউরোপ যেভাবে যা যা করেছিল, ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদেরও প্রস্তাব দেওয়া হবে। তবে এটা ঘটবে তখনই, যখন চীন বাংলাদেশে নিজের কর্তৃত্ব শতভাগ প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। যেহেতু বাংলাদেশটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা দেশ, তাই বিবদমান প্রতিটি পক্ষই ইসলামপন্থি কোনো না কোনো একটা দলকে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। নয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ ওপরে ইসলামের খোলসটা রেখে ভেতর থেকে গণতান্ত্রিক মতাদর্শই চালু থাকবে। যাকে বলে বিষের ওপরে মধুর প্রলেপ। এক্ষেত্রে কোন ইসলামপন্থি দলকে কে কাছে টানবে, এর একটা ধারণা দিতে পারি।

১. আমেরিকা জামায়াতে ইসলামকে কাছে টানবে বা টেনেছে। কারণ, আমেরিকা ও ইউরোপের সাথে জামায়াতে ইসলামীর বোঝাপড়া অনেক আগে থেকেই ভালো। তা ছাড়া জামায়াত একটা গণতান্ত্রিক দল। মডারেট মুসলিম। দীর্ঘদিন সরকার দলে ছিল। রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে। সাংগঠনিক কাঠামো বেশ সংগঠিত। আর্থিকভাবে সচ্ছল। রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতরে নিজস্ব লোকবল আছে। সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য একটা অংশকে তারা ওউন করে।

২. বাংলাদেশের ওই তৃতীয় শক্তিটা–অর্থাৎ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীনপন্থি অংশটা হিযবুত তাহরীরকে টানবে বা টেনেছে। হিযবুত তাহরীরও বেশ সংগঠিত। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির কারণে সামরিক ক্যু করতে হলে রাজপথে দশ লাখ কর্মী জড়ো করতে পারবে। রাষ্ট্র পরিচালনার মেথডলজি জানে। যারা হিযবুত তাহরীরের দাওয়াত সরাসরি পেয়েছেন, তারা বুঝবেন যে, আমি কী বলতে চাচ্ছি। তাদের দাওয়াতের মূল বক্তব্যের সারাংশ হলো–রাসূল (সা.) কর্তৃক আউস ও খাজরাজ গোত্রের কাছে নুসরা চাওয়ার অনুকরণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে নুসরা চাওয়া, চীনের কোনো মতাদর্শ নেই বলে চীনকে মুসলমানদের জন্য হুমকি মনে না করার মতো একচোখা নীতিতে চলা, আমেরিকার পতন ঘটানো, ঢালাওভাবে কওমি মাদরাসাগুলোকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা।

৩. আওয়ামী লীগ হেফাজতে ইসলামের বি টিমকে টানবে বা টেনেছে। হে.ই.বি খুব দুর্বল। নিজেরাই ভেঙে খানখান। নেতৃত্ব দেওয়ারও কেউ নেই। আওয়ামী লীগ এক্ষেত্রে একটু পিছিয়ে গেছে। কারণ, দীর্ঘদিন জোর করে ক্ষমতা ধরে রাখলে কৌশলী উপায়ে হলেও বন্ধু পেতে একটু কষ্ট হয়। তাই বলে আওয়ামী লীগ একেবারে বসে নেই। আওয়ামী লীগের নৌকার পালে কীর্তনখোলা নদী থেকে শুরু করে শীতলক্ষ্যা নদীর বাতাস লাগছে। অধিকন্তু নিজেদের বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মীদের পুত্রসন্তানদের তারা 'আলেম' ও 'দাঈ' বানিয়েছে। মাদরাসা ও জেনারেল এজুকেশন সেক্টর থেকে বের হয়ে তারা দ্বীনের দাওয়াতের নামে আওয়ামী লীগকে সেভ করবে বা করছে। তারা কিন্তু বেশ জনপ্রিয়ও।

★ আওয়ামী লীগকে ততটা দুর্বল ভাবার কিছু নেই। আওয়ামী লীগ দলের ভেতরে ছাত্রলীগ-যুবলীগের মতো অশিক্ষিত ক্যাডার যেমন আছে, আওয়ামী লীগের কাছে ভালো ভালো থিঙ্ক ট্যাংকও আছে। এই একটা অ্যাচিভমেন্টের জন্যই আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একের পর এক দাবার চাল দিয়ে যাচ্ছে। ফলে পশ্চিমারা কায়দামতো আওয়ামী লীগকে কুপোকাত করতে পারছে না। আওয়ামী লীগ বেশ কৌশলীভাবে কাজ করছে। তা ছাড়া আরেক থিঙ্ক ট্যাংকের দল ডিজিএফআই তো আছেই। মানেন বা না মানেন, এখনও পর্যন্ত ডিজিএফআই ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা গোয়েন্দা সংস্থা।

★ চীনও তো আর বসে নেই। চীন কখনোই চাইবে না বাংলাদেশে একটা ঝামেলা তৈরি হোক। শুধু বাংলাদেশই না, পাকিস্তান, মিয়ানমার, আফ্রিকান দেশগুলো; কোথাও কোনো ঝামেলা বাধাতে চীন দেবে না। কারণ, এতে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মার্কিন ডলার নিয়ে যত সমস্যা দেখছেন, এটা অচিরেই কেটে যাবে। কেটে যাবে বলতে, মার্কিন ডলার তার গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। ইতোমধ্যে হারিয়েছেও। আগামী দশ বছরে ওটা তত আর দরকার হবে না। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে চীন থেকে। সম্প্রতি চীনা কারেন্সিতে আমদানি শুরু হয়েছে। মার্কিন ডলারের কি খুব বেশি দরকার আছে আর? উঁহু, নেই। খোদ আমেরিকাই তো পণ্য আমদানির জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীল।

★ ওদের শেষ অস্ত্র হলো—ওরা বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের উসকে দেবে। এমন এমন কাজ করবে যে, ইসলামপন্থীরা মাঠে নেমে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হবে। আমার কথা হলো—মাঠে নামেন অথবা খাটে শুয়ে থাকেন, যা ইচ্ছে করেন। কিন্তু ওদের দ্বারা ব্যবহৃত হবেন না। নিজের বুদ্ধিতে ফকির হয়ে যান। তবুও ওদের বুদ্ধিতে আমির হতে যাবেন না।

====> অলসতার কারণে দীর্ঘ করে আরও যা যা বলতে পারিনি, তা এখানে অ্যানোটেশন আকারে বিক্ষিপ্তভাবে লিখে দিলাম। কথাগুলোকে উপসংহার হিসেবে দেখার অনুরোধ রইল।

★ রে.নি.জ.ঘো.ক.হ. ★

Border of India’s Seven Sisters shared among some states of Myanmar

Borders of Seven Sisters with Bangladesh & Myanmar

ZOMI INHABITED AREAS
INDIA
NAGALAND STATE
KACHIN STATE
CACHAR HILLS
ASSAM
IMPHAL
MANIPUR STATE
TRIPURA STATE
AIZAWL
MIZORAM STATE
SAGAING DIVISION
MYANMAR
BANGLADESH
CHITTAGONG HILL TRACT
HAKHA
CHIN STATE
ARAKAN STATE
MAGWAY DIVISION
BAY OF BANGAL
INDEX
N
W
E
S
NOT TO SCALE

Zogam State

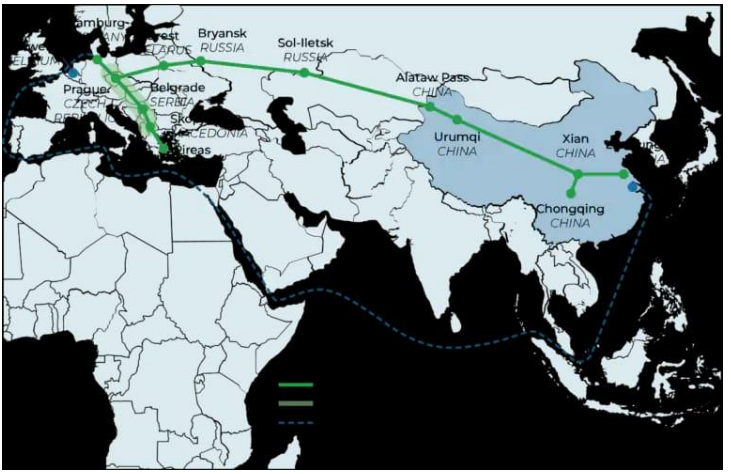

The New Eurasian Land Bridge

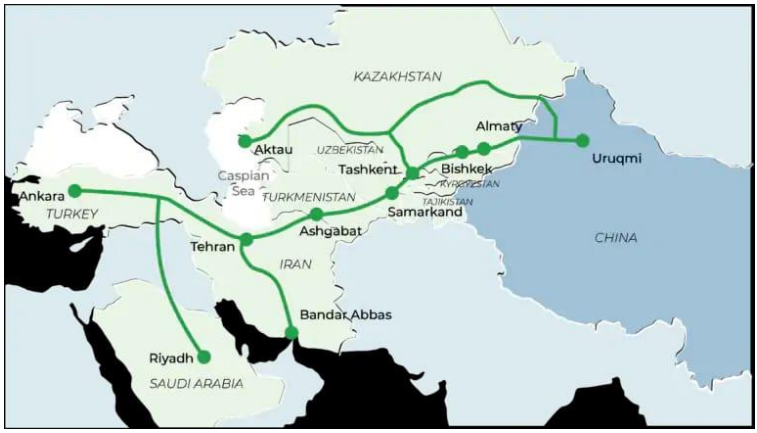

The China - Central Asia - West Asia Corridor

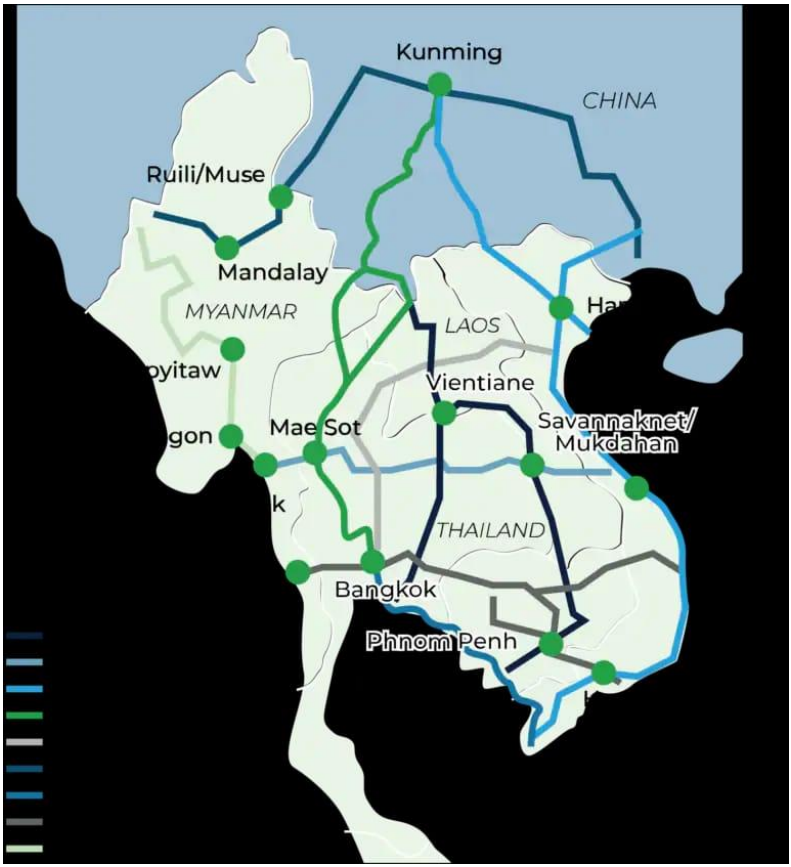

The China - Indochina Peninsula Economic Corridor

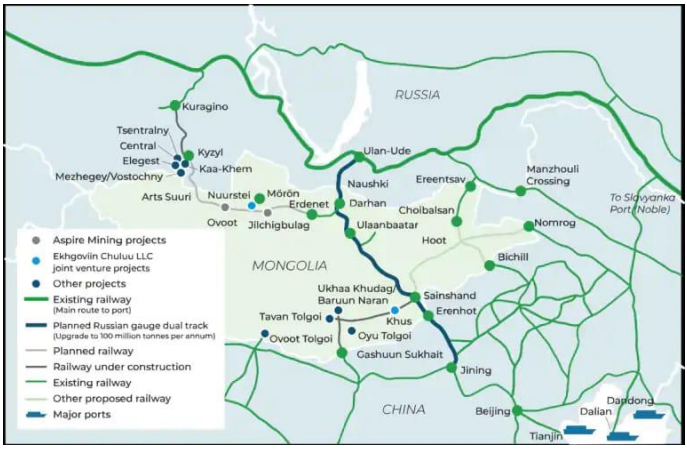

The China - Mongolia - Russia Corridor

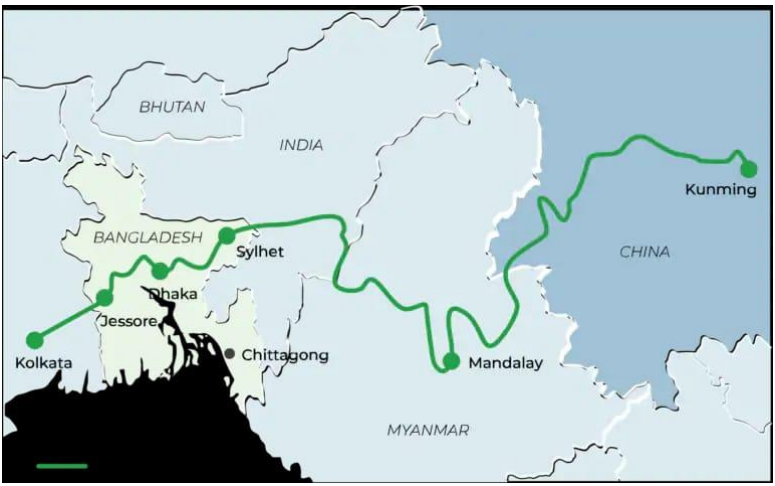

The China - Myanmar - Bangladesh Corridor

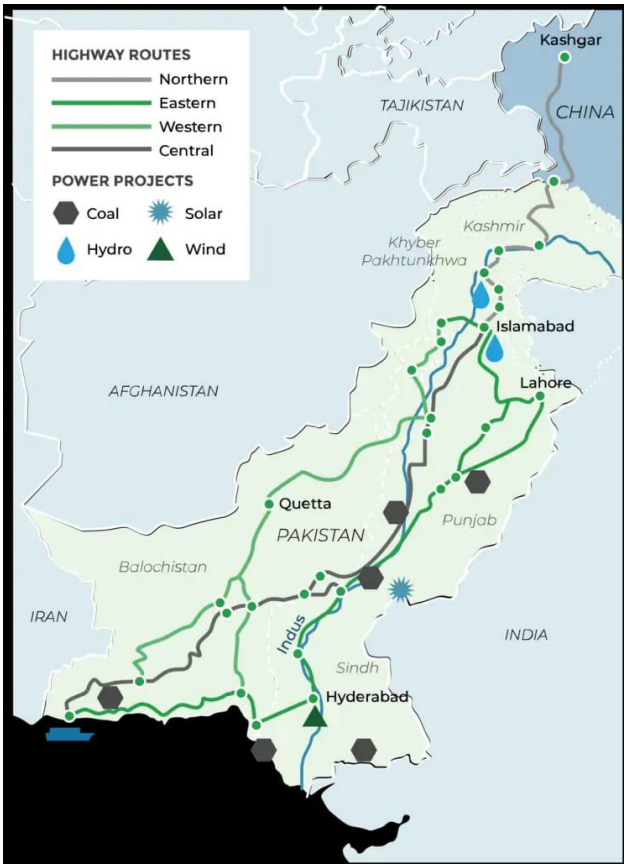

The China - Pakistan Economic Corridor

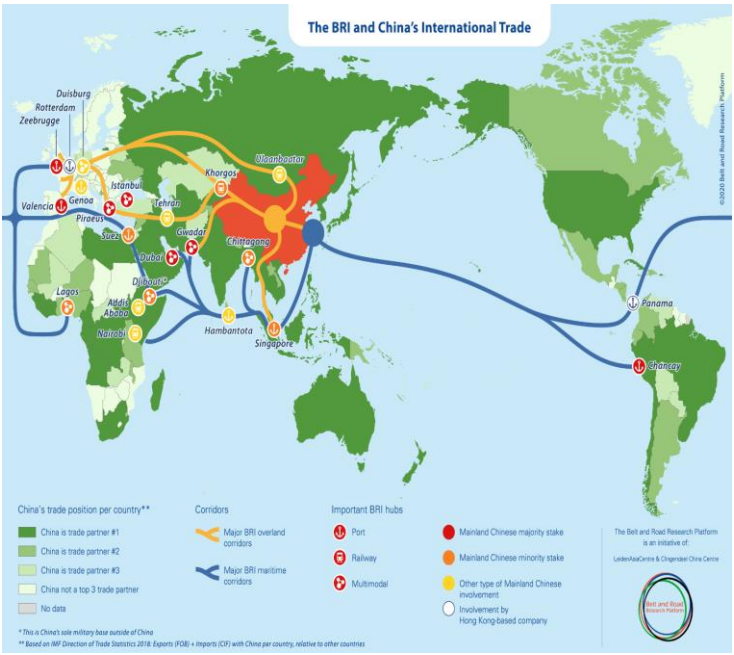

Maritime Silk Road (to Europe)

Maritime Silk Road (9 Main Sea-Ports)

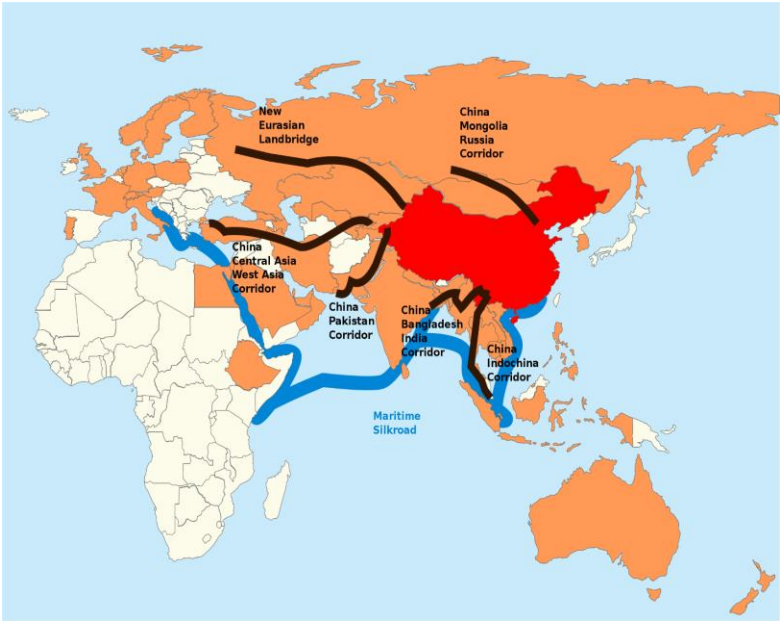

Belt Road Initiative & Maritime Silk Road in World Map

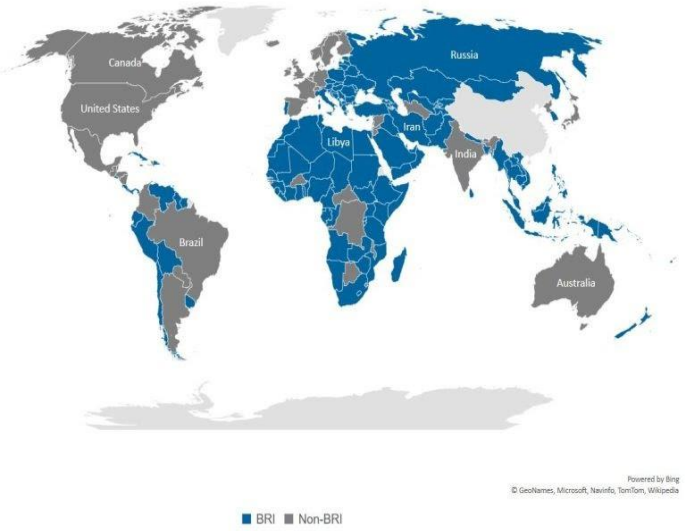

Countries joined in BRI Project

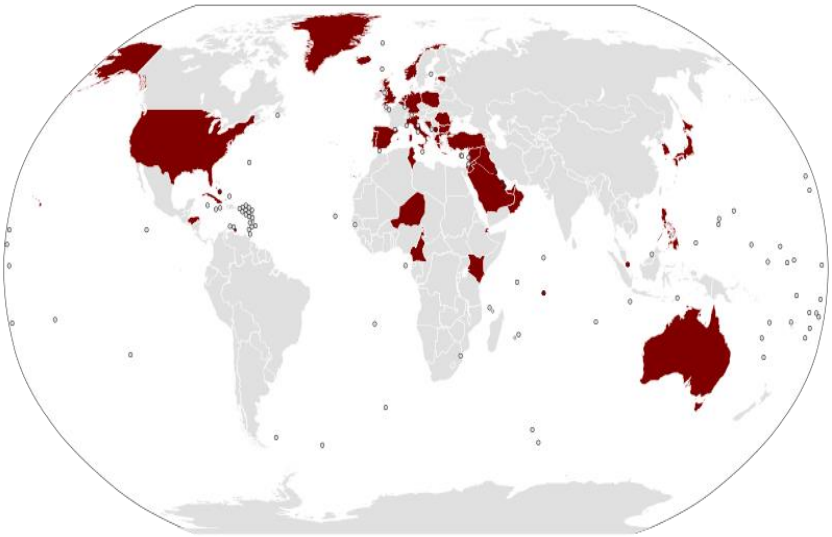

US Military Bases throughout the world

China & Bangladesh in world map

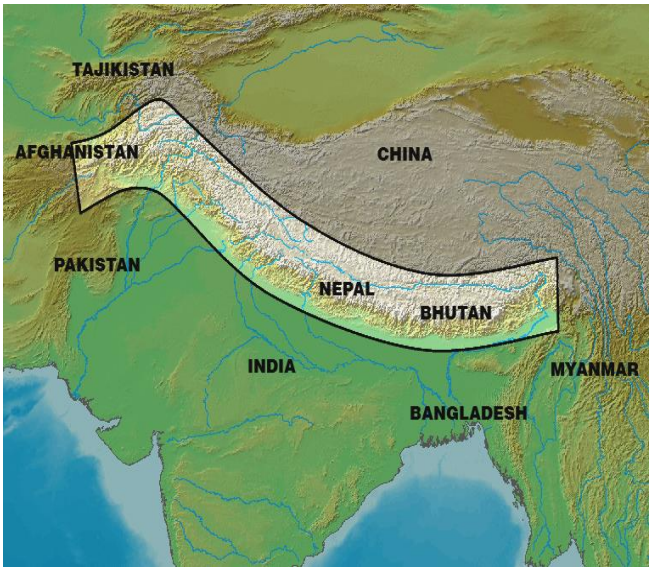

Himalaya range between China & India

Eight thousanders & highest peaks between China, India & Pakistan

BRI link road from Tibet to Xinjiang near Indian border

Karakoram Range

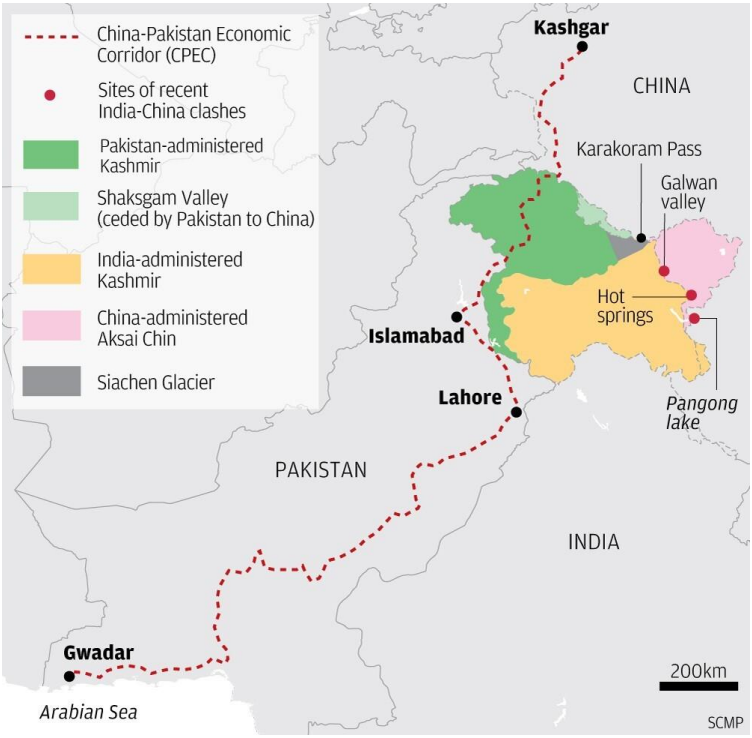

Karakrom Highway from Kashgar to Gwadar through Azad Kashmir

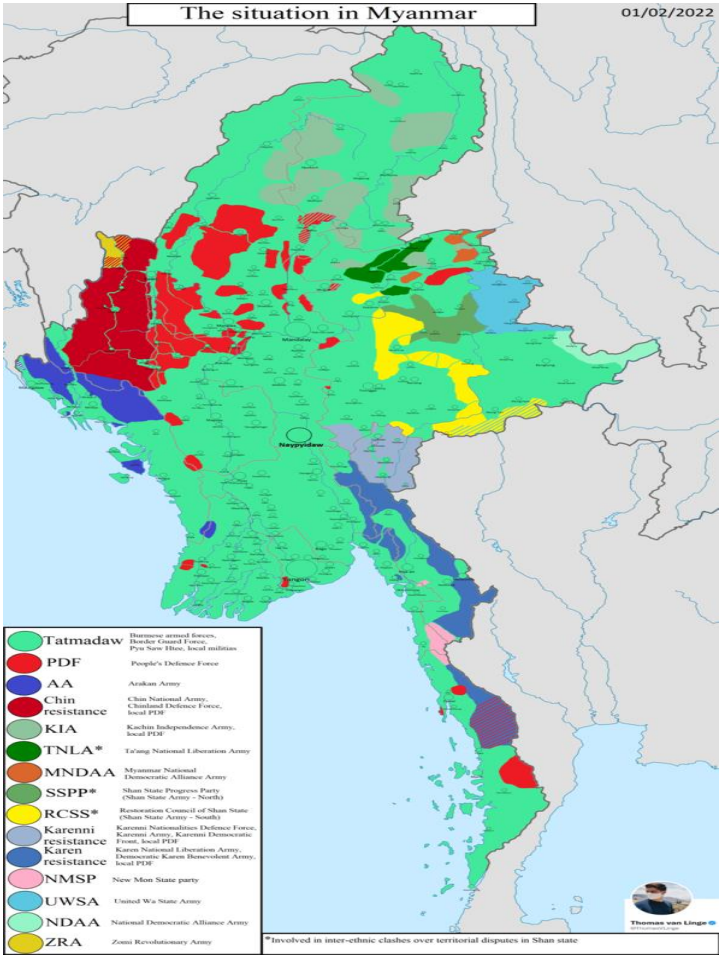

Rebel Groups in Myanmar